স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর
ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)

নারী অধিকার, আইন এবং ক্ষমতায়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ ম্যানুয়েল

আগস্ট ২০২০

এলজিইডি সদর দপ্তর, আরডিইসি ভবন (লেভেল-৬)
শেরেবাংলা নগর, আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭।

সূচিপত্র

অধিবেশন-১ ....১

রেজিষ্ট্রেশন..১

অধিবেশন-২ ....২

উদ্বোধন ২

অধিবেশন-৩ ....৩

প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণ সূচি পর্যালোচনা ও প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী নির্ধারণ ৩

অধিবেশন-৪..৫

নারী অধিকার ও আইন ৫

০৭ নভেম্বর ২০১৯ দুর্যোগে সব সামলান নারী, নাম হয় পুরুষের!..১৭

নারী শ্রমিকের আর কত লাশ আসবে?..১৯

সাধারণত শ্রমিকদের শ্রম আর কষ্টের কথাটা বুঝাতে শ্রম-ঘাম একটা জুতসই শব্দ। শ্রমে-ঘামে যুদ্ধ করে প্রবাসের শ্রমিকরা দেশে রেমিটেন্স পাঠায়। প্রবাসীদের এ রিমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখে । যদি দেড় কোটি মানুষও বাংলাদেশের বাইরে থাকে, তাহলে কম করে হলেও ৫ থেকে ৬ কোটি মানুষ এই দেড়কোটি মানুষের উপরই নির্ভরশীল থাকেন সরাসরি। এছাড়া আছে রেমিটেন্স, এই রেমিটেন্সের প্রবাহ থেকে আসা রাষ্ট্রীয় আয়। বাস্তবতা হল, এদের প্রায় সবাই-ই দেশে তাদের পরিবার দেখাশোনা করে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরা দেশটিতে দিচ্ছেন তাদের সর্বোচ্চ অংশ।......................১৯

অধিবেশন-৫ ....২৪

নারীর ক্ষমতায়ণ ও নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুষের ভূমিকা ২৪

অধিবেশন-৬ ....২৭

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ ঃ ২৭

অধিবেশন-৭..৩৬

সমাপ্ত..৩৬

অধিবেশন-১

রেজিস্ট্রেশন

অধিবেশন-২

উদ্বোধন

অধিবেশন-৩
প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণ সূচি পর্যালোচনা ও প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী নির্ধারণ

উদ্বোধন, প্রত্যাশা যাচাই, প্রশিক্ষণ সূচি পর্যালোচনা ও প্রশিক্ষণের নিয়মাবলী নির্ধারণ

প্রশিক্ষণার্থীদের সকলকে দুজন দুজন করে ভাগ করুন। সকলকে বুঝিয়ে বলুন যে, আমরা এখন আমাদের বন্ধুর পরিচয় ও ২টি করে গুণ জেনে নেব এবং সবার সামনে এসে শোনাবে।

প্রতি দলকে তাদের জোড়ার পরিচয় ও গুণ জানার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। এবার সবাইকে আবার জায়গায় গিয়ে বসার আহ্বান জানান এবং একে একে প্রত্যেক দলকে আহ্বান করুন তাদের বন্ধুর পরিচয় দেবার জন্য।

পরিচয়ের সময় তারা ঃ

(ক) একে অন্যের নাম বলবেন।
(খ) একে অন্যের ২টি করে ভালো দিক বা গুণ বলবেন।

পরিচিতি পর্ব

ভূমিকাঃ প্রশিক্ষণের প্রথম দিনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে পারস্পরিক পরিচিতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আমাদের এই প্রশিক্ষণের অংশগ্রহণকারীরা যদিও পরস্পরের পরিচিত, তবুও দীর্ঘদিন পর তারা প্রশিক্ষণের জন্য এক জায়গায় বসেছেন। তাই প্রশিক্ষণে বন্ধুত্বপূর্ণ ও শিক্ষণে সহায়ক পরিবেশ সৃষ্টির জন্য এই আয়োজন।

প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য ঃ   এই প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারী বৃন্দ যা করতে পারবেন ঃ

- জেন্ডার কনসেপ্ট সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- জেন্ডার কেন উন্নয়ন ইস্যু তা বলতে পারবেন।
- নারী-পুরুষের মধ্যকার বর্তমান অসমতা ও তার কারন ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- নারী-পুরুষের অসমতা দূর করার ক্ষেত্রে নিজেদের ভূমিকা সমূহ চিহ্নিত করতে পারবেন।
- নারী উন্নয়ন নীতিমালার বৈশিষ্ট্যগুলি পৃথকীকরণ করতে পারবেন।
- পানি ব্যবস্থাপনা প্রকল্পের সকল কাজে কিভাবে নারীদের সম্পৃক্ত করা যায় সে সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- জেন্ডার সমতা আনয়নে ব্যক্তিগত, পারিবারিক, কর্মক্ষেত্র ও সমাজ জীবনে কি করণীয় তা জানতে ও ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

প্রত্যাশা

প্রশিক্ষণার্থীদের সকলকে দুজন দুজন করে ভাগ করুন। সকলকে বুঝিয়ে বলুন যে, আমরা এখন আমাদের বন্ধুর পরিচয় ও ২টি করে গুণ জেনে নেব এবং সবার সামনে এসে শোনাব।

প্রতি দলকে তাদের জোড়ার পরিচয় ও গুণ জানার জন্য ৫ মিনিট সময় দিন। এবার সবাইকে আবার জায়গায় গিয়ে বসার আহ্বান জানান এবং একে একে প্রত্যেক দলকে আহ্বান করুন তাদের বন্ধুর পরিচয় দেবার জন্য।

পরিচয়ের সময় তারা ঃ

(ক) একে অন্যের নাম বলবেন।

(খ) একে অন্যের ২টি করে ভালো দিক বা গুণ বলবেন।

সবার পরিচয় জানার পর সকলকে ধন্যবাদ দিন এবং উপসংহার টানুন এভাবে যে, আমরা সবার পরিচয় ও তাদের ভালো দিকগুলি জানলাম। এ প্রশিক্ষণে আমরা চেষ্টা করবো আমাদের ভালো দিকগুলি মনে রাখতে ও কাজে তার পরিচয় দিতে। ইচ্ছা করলে আমরা অন্যের কাছ থেকে তার গুণ গুলো শিখতে পারি যা ভবিষ্যতে কাজে লাগতে পারে।

প্রত্যাশা যাচাই ও প্রশিক্ষণ সূচি পর্যালোচনা

অংশগ্রহণকারীগণ এই প্রশিক্ষণ কোর্স থেকে কি বিষয় জানতে চান বা এই কোর্স হতে তাদের প্রত্যাশা কি তা জিজ্ঞেস করুন। তাদের মতামত পর্যালোচনা করুন এবং প্রত্যাশাসমূহ এক এক করে ফ্লিপচার্ট পেপারে লিখুন।

প্রত্যাশা লিখা ফ্লিপচার্টটি মাস্কীং টেপ দিয়ে প্রশিক্ষণ কক্ষের দেয়ালে লাগিয়ে রাখুন, অংশগ্রহণকারীদের বলুন, প্রশিক্ষণের শেষ দিন কোর্স পর্যালোচনার সময় আমরা এগুলো মিলিয়ে দেখব।

ফ্লিপচার্ট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ সূচী ব্যাখ্যা করুন। অংশগ্রহণকারীদের কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন।

প্রশিক্ষণ কোর্সের উদ্দেশ্য

ফ্লিপচার্ট এর মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কোর্সেও উদ্দেশ্য সমূহ এক এক করে ব্যাখ্যা করুন। এ সম্পর্কে কারো কোন প্রশ্ন থাকলে তার উত্তর দিন। সক্রিয় অংশগ্রহণের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ এবং প্রথম অধিবেশনের আহবান জানিয়ে সমাপ্তি টানুন।

প্রশিক্ষণ নিয়মাবলী

প্রশিক্ষণের নিয়মাবলি প্রশিক্ষণার্থীদের কাছ থেকে জানতে চান এবং তা ফ্লিপচার্টে লিখে টেপ দিয়ে দেয়ালে লাগাতে হবে।

অধিবেশন-৪
নারী অধিকার ও আইন

জাতীয় পর্যায় আইন ঃ

ক) নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা হবে। নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসুচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠানসমুহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

খ) জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) ঃ নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ পরিষদে কার্যপরিধি নিম্নরুপ ঃ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়নমূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।
- শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের নিমিত্তে সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজনবোধে নতুন আইন ও বিধিমালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইনসমুহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।
- নারী ও শিশু উন্নয়নের প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডে) ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।
- নারীদের আইনগত অধিকার, নারী উন্নয়ন এবং নারীদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সমন্ধে নীতি প্রণয়ন।
- সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহন ও তাদের ভাগ্য উন্নয়ন সর্ম্পকে গৃহিত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।
- পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

গ) সংসদীয় কমিটি ঃ বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক গঠিত নারী বিষয়ক সংসদীয় স্থায়ী কমিটি নারী উন্নয়ন কর্মসূচী পর্যালোচনা করে নারী অগ্রগতির লক্ষ্যে সরকারকে সুনির্দিষ্ট উদ্যোগ গ্রহণ করার পরামর্শ প্রদান করবে।

ঘ) নারী উন্নয়নে ফোকাল পয়েন্ট ঃ বিভিন্ন ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতির আলোকে কর্মসূচী গ্রহণ, প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করবে। বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থায় নারী উন্নয়ন কার্যক্রম যাতে যথাযথ সম্পন্ন করা যায় সে জন্য ঐ প্রতিষ্ঠানসমূহে নূন্যতম পক্ষে যুগ্ন-সচিব/যুগ্ন-প্রধান পদমর্যাদা সম্পন্ন কর্মকর্তাকে ফোকাল পয়েন্ট হিসাবে মনোনীত করা হবে। নারী উন্নয়নের কার্যক্রমের নিয়মিত মনিটরিং এর উদেশ্যে মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার মাসিক এডিপি পর্যালোচনা সভা ও মাসিক সমন্বয় সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনা করা হবে। তাছাড়া ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কার্যক্রম যাতে জেন্ডার প্রতিফলিত হয় তাদের বিভিন্ন প্রতিবেদন ও দলিলসমুহে জেন্ডার বিষয়ে সুস্পষ্ট ও পর্যাপ্ত তথ্য সন্নিবেশিত হয় সে লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে।

ঙ) মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রীকে সভাপতি এবং নারী উন্নয়নে চিহ্নিত ফোকাল পয়েন্ট মন্ত্রণালয় ও সরকারী - বেসরকারী নারী উন্নয়নমূলক সংস্থায় প্রতিনিধিদের নিয়ে একটি "নারী উন্নয়ন বাস্তবায়ন ও মূল্যায়ন কমিটি" গঠন করা হবে। এই কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয় ও সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

জেলা ও উপজেলা পর্যায় ঃ

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নারী উন্নয়নকল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

তৃণমূল পর্যায় ঃ

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসাবে সংগঠিত করা হবে। এ দল সমুহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসাবে রূপ দেওয়া হবে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠনগুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে। উপরন্তু, তৃণমূল পর্যায়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা ঃ

প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। এই কাজে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে যাতে করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসরকারি ও সামাজিক সংগঠন সমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবেঃ

ক) গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নে সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্তকরণ ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

খ) জাতীয় থেকে তৃণমূল ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধির ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা ঃ

নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষনা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষন প্রতিষ্ঠান ঃ

ঢাকায় বিদ্যমান নারী উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান শক্তিশালী করণসহ বিভাগ, জেলা, উপজেলায় প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তোলা হবে। এসব কেন্দ্রে বিভিন্ন কারিগরি, বৃত্তিমূলক, নারী অধিকার এবং শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীগত কৌশল ঃ

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংগঠনসমুহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহন করবে।

- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটানো হবে। যাতে করে সকল খাতে নারীর সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।

- সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হবে।

- মনিটরিং ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অগ্রগতির নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।

- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে যাতে নারী প্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নকারী কর্মকর্তা বৃন্দকে পিএটিসি, প্লানিং একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচীতে ও কোর্সে জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হবে।

- নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই সচেতনতা কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (১) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদা হানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ (২) মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাবৃন্দের সচেতনতা এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নানা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভূক্তকরণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।

- সমাজের সকল স্তরে বিশেষভাবে প্রনীত এবং সুষ্ঠু অর্থায়নের ভিত্তিতে নারী বিষয়ক সংবেদনশীলকরণ কর্মসূচী নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন, বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং সরকারি-বেসরকারি সকল উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি আকর্ষন করা হবে। নারীর প্রতি সংবেদনশীলতাকরণ কর্মসূচী সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সকল চলতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে সমন্বিত করা হবে।

- নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচীর উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহন করতে উধ্বুদ্ধ করা হবে। সে সব কর্মসূচীতে সচেতনতা, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুর্নবাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ কৌশল হিসাবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধি বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।

আর্থিক অবস্থা ঃ

- তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেল পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।
- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (জিআরবি) অনুসরণ অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থের সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।
- উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যেমন- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী চিহ্নিত করে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।
- পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, গৃহায়ন, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপ-খাতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।
- বাণিজ্যিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহ কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র ও মাঝারি নারী উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ঃ

নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরে সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতা যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানসমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়পযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক আর্থিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা উৎসাহিত করা হবে।

উন্নয়নের পর্যায় এবং সূচক বা মাপকাঠি ঃ

ব্যক্তি	পরিবার	সমাজ
• জড়তাহীন	• আয়	• শিক্ষা ক্ষেত্রে ছেলে ও মেয়ে উভয়ের উপস্থিতি
• শিক্ষিত	• শিক্ষা	• নিরাপত্তা
• দক্ষ/দক্ষতা	• ভাল স্বাস্থ্যের অধিকারী	• ন্যায়বিচার
• প্রযুক্তিগত ধারণা বা দক্ষতা	• বিশুদ্ধ পানির ব্যবহার	• কুসংস্কার হীনতা
• অভিজ্ঞতা	• পাকা পায়খানা ব্যবহার	• সন্ত্রাস এর হার কমানো
• আয়	• পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা	• সামাজিক কর্মকান্ডে নারীর অংশগ্রহণ
• পদোন্নতি	• চিকিৎসা সেবাপ্রাপ্তি	• যৌতুক বিহীন বিয়ে

• ইতিবাচক আচরণ/দৃষ্টিভঙ্গি • গ্রহণযোগ্যতা • মতামত প্রকাশ • সিদ্ধান্ত গ্রহণ ক্ষমতা • রুচিবোধ বা পছন্দ	• সম্পদ • পরিবারের গ্রহণযোগ্যতা • সংস্কৃতি ও বিনোদনের চর্চা • সামাজিক কাজে অংশগ্রহণ • সকলকে সমান চোখে দেখা • অবস্থান বা ক্ষমতা	• বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, বিবাহ বিচ্ছেদের হার হ্রাস • নারী নির্যাতনের হার হ্রাস • জন্ম নিবন্ধনের হার বৃদ্ধি • বিবাহ রেজিস্ট্রেশনের হার বৃদ্ধি

উন্নয়নে নারী (WID) ঃ

- ৭০ এর দশকে আধুনিকায়ন তত্ত্বে ও সমালোচনার ধারায় এর উদ্ভব।
- নারীরা কেবল পুন:উৎপাদন মূলক ভূমিকায় আবদ্ধ। এই ধারণার বিপরীতে নারীদের উৎপাদন মূলক কাজের প্রতি জোর দেওয়া হয়। কৃষিতে অবদানের উপর জোর দেওয়া হয়।
- WID তে ধরে নেওয়া হয় যে, নারীরা সম্পদ, দক্ষতা ও সুযোগের অভাবে উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত নয়। তাই তাদের উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সম্পৃক্ত করতে হবে।
- নারীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অংশীদার হলে বিদ্যমান বৈষম্যমূলক জেন্ডার সম্পর্ক আপনা আপনি বিলোপ হবে।
- এই নীতিমালা আইনগত ও প্রশাসনিক সংস্কারের মাধ্যমে নারীকে অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে যুক্ত করার উপর জোর দেয়।
- এটা একটা কল্যানমূখী দৃষ্টিভঙ্গি যেখানে নারীদের গৃহকর্মেও উন্নয়ন ও সন্তান উৎপাদনী ভূমিকা সম্পর্কিত চাহিদা পূরণের কথাও বলে।

"উন্নয়নের নারী" নীতিমালার কর্মকৌশল (WID) ঃ

- উন্নয়ন উদ্যোগ গুলিতে নারীরা কিভাবে আরো ভালভাবে সম্পর্কিত হতে পারে সে দিকে আলোকপাত করা;
- নারীদের আয় উপার্জনমূলক কর্মকান্ডে যুক্ত করা;
- শিক্ষা ও কর্মক্ষেত্রে নারীর সমান অংশগ্রহণের লক্ষ্যে কাজ করা;
- প্রযুক্তি ব্যবহারের ক্ষেত্রে নারীর সুযোগ সৃষ্টি করা;
- নারীর কাজের বোঝা লাঘবের জন্য লাগসই প্রযুক্তি প্রবর্তন;
- নারীর জন্য ঋণ প্রদান ও ঋণ সেবা প্রসারিত করা;
- নারী স্বাস্থ্য, পুষ্টি, শিশুপরিচর্যা ইত্যাদি কল্যাণমুখী দিকের উন্নয়ন সাধন;

"উন্নয়নের নারী"- এর সীমাবদ্ধতা ঃ

- উন্নয়নের নারী নীতিমালা এমন প্রচলিত ধারণা পোষণ করে যে, নারীরা উন্নয়ন প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়।

- প্রচলিত বৈষম্যমূলক সামাজিক কাঠামোকে মেনে নেয়। কখনই নারীর প্রচলিত অধঃস্তুতার উৎস সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে না।
- সংঘাতহীন, আপোষ কামী মনোভাব পোষণ করে এবং উন্নয়ন কর্মকান্ড থেকে নারীরা পুরুষের সমান উপকৃত না হওয়ার কারণ উদ্‌ঘাটনে উদ্যোগী হয় না।
- নারীর দারিদ্রতা ও অধঃস্তন অবস্থার মূল কারণ স্বরূপ পুরুষতন্ত্রকে চ্যালেঞ্জ করে না।
- শ্রেণী, বর্ণ, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদিকে উপেক্ষাকওে নারীদের একটি আলাদা বা বিচ্ছিন্ন গ্রুপ হিসাবে দেখা হয় এবং বিচ্ছিন্ন ভাবে নারীর চাহিদা পূরণ করার চেষ্টা করা হয়।
- নারীর জীবনের উৎপাদনশীল (Productive) দিকের উপর বেশি জোর দেওয়া হয়। কিন্তু নারীর প্রজনন বা পুনঃউৎপাদনমূলক (Reproductive) ভূমিকাকে অবমূল্যায়ন করা হয়।
- সম্পদের অপর্যাপ্ততা এবং নারীর অনভিজ্ঞতার প্রশ্ন তুলে নারী উন্নয়নকর্মকান্ডের পরিধিকে প্রায়শই সীমিত করা হয়।
- ধরে নেওয়া হয় যে, নারীরা উন্নয়ন কর্মকান্ডের অংশীদার হলে নারীর বিদ্যমান অধঃস্তন অবস্থা আপনা আপনি পরিবর্তিত হবে।

এখানে উল্লেখ্য যে শত সীমাবদ্ধতা সত্তেও উন্নয়নের নারী নীতিমালাই প্রথম নারী উন্নয়ন নীতি বা উন্নয়ন তত্ত্ব ও প্রয়োগের ক্ষেত্রে নারী ইস্যুটিকে মূর্তভাবে সামনে নিয়ে আসে।

নারী এবং উন্নয়ন (WAD) ঃ

- ৭০ এর দশকের মাঝামাঝি সময়ে WID এর সমালোচনার ধারায় এর উদ্ভব ঘটে। নির্ভরশীলতার তত্ত্ব এর ভিত্তি।
- এই তত্ত্ব মতে বাস্তবে এমন একটি বৈষম্যময় আন্তর্জাতিক কাঠামো বিরাজ করে যা ৩য় বিশ্বের অর্থনীতি শিল্পোন্নত ১ম বিশ্বের অর্থনীতির স্বার্থের সেবা করে।
- WAD এই পরনির্ভরশীলতা থেকে উন্নয়নের লক্ষ্যে ৩য় বিশ্বে নারীদের আরো বেশী করে উৎপাদনের সাথে সম্পৃক্ত করার কথা বলে।
- WAD মনে করে নারীরা সব সময় উৎপাদন প্রক্রিয়ার অংশ।
- WAD নারীরা উন্নয়নের শোষন মূলক প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত। যা বিদ্যমান বৈষম্যমূলক আন্তর্জাতিক কাঠামো বজায় রাখতে সহায়তা করে।

জেন্ডার এবং উন্নয়ন (GAD) ঃ

- ৮০ এর দশকে এই তত্ত্বের উদ্ভব ঘটেছে।
- GAD নারীর জীবনের সকল দিককে ধারণ করে।
- নারী কর্তৃক সম্পাদিত উৎপাদন মূলক, পুন:উৎপাদন মূলক, সামাজিক সকল ধরণের কাজের উপর মনোযোগ দেয়।
- পারিবারিক ও সাংসারিক কাজকে অবজ্ঞা করার যে কোন প্রচেষ্টাকে নাকচ করে দেয়।
- GAD নারীর অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার লক্ষ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের উপর গুরুত্ব আরোপ করে।

জেন্ডার এবং উন্নয়ন-এর বৈশিষ্ট্য (Characteristics of GAD) ঃ

নিছক নারী উন্নয়ন নয়, নারী-পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়নে মনোযোগ কেন্দ্রীভূত করে;

- পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করে;
- নারীকে সমস্যা নয়, সমাধানের কারক রূপে দেখে;
- সমস্যার উপসর্গ কারণগুলোকে চিহ্নিত করে;
- নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসম বা বৈষম্যমূলক সম্পর্ক পুনর্বিন্যাসের দাবি জানায়;
- নারীর অবস্থাকে বৈষম্যমূলক সামাজিক প্রক্রিয়ার ফলস্বরূপ দেখে;
- নারীর বিরাজমান পুরুষতান্ত্রিক সমাজ কাঠামোকে চ্যালেঞ্জ করে তার অবসান চায়;
- নারী-পুরুষের মধ্যে প্রচলিত কাজের বরাদ্দ, দায়-দায়িত্ব অর্থাৎ সমাজ কর্তৃক আরোপিত জেন্ডার ভিত্তিক শ্রম বিভাজনের বিলুপ্তি দাবি করে;
- পরিবার ও পরিবারের বাইরে নারীর সকল পারিশ্রমিক বিহীন কাজ ও অবদানের যথাযথ মূল্য ও স্বীকৃতি প্রদান করে;

নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট (CEDAW) ঃ

ভূমিকা

নারী ও পুরুষের মাঝে বিরাজমান সকল প্রকার বৈষম্য দূর করে সম অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ১৯৭৯ সালের ১৮ই ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদে সর্বসম্মতিক্রমে "নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ" টি গৃহীত হয়। ইংরেজীতে একে বলা হয় Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women যা সংক্ষেপে CEDAW (সিডো) নামে পরিচিত।

১৯৮০ সালের ১লা মার্চ থেকে এই সনদে স্বাক্ষর শুরু হয় এবং ১৯৮১ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর থেকে সনদটি কার্যকর হয়। ১৯৯৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ১৬৫টি রাষ্ট্র এই সনদ অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে।

বাংলাদেশ এই দলিল অনুমোদন করে স্বাক্ষর করেছে ১৯৮৪ সালের ৬ই নভেম্বর। অনুমোদন কালে যদিও বাংলাদেশ সরকার ২, ১৩ (ক) এবং ১৬.১ (গ) ও (চ) ধারাগুলো আপত্তিসহ স্বাক্ষর করেছে। পরবর্তীতে আপত্তিগুলো প্রত্যাহার করার ব্যাপারে জাতীয় পর্যায়ে গঠিত রিভিউ কমিটির সুপারিশ ক্রমে ১৯৯৭ সালের ২৪শে জুলাই ১৩ (ক) ও ১৬.১ (চ) ধারাগুলো থেকে বাংলাদেশ তার আপত্তি প্রত্যাহার করে নিয়েছে। তবে ধারা ২ এবং ১৬.১ ৯ (গ) থেকে আপত্তি প্রত্যাহার করে নেওয়ার বিষয়টি এখনও প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সিডো দলিলের মূল মর্মবাণী হলো, সমাজ ও সভ্যতার ক্রমবিকাশে যুগ যুগ ধরে নারী যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে, সেই ভূমিকায় যথাযথ স্বীকৃতি দান, সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা স্থাপন নিশ্চিত করণ এবং মানুষ হিসাবে নারীর সার্বিক উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি।

এই সনদে স্বাক্ষর কারী রাষ্ট্র সমূহ সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও নাগরিক নির্বিশেষে সকল ক্ষেত্রে নারী-পুরুষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠার জন্য অঙ্গীকারাবদ্ধ। এই লক্ষ্যে রাষ্ট্রসমূহে প্রচলিত যেসব আইন, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথা ব্যবস্থা, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য সৃষ্টি করে সেগুলো পরিবর্তন বা বাতিল করবে এবং প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করবে। এছাড়াও, আইনের যথাযথ বাস্তবায়নের জন্য রাষ্ট্র সমূহ সকল প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

ধারা-১ নারীর প্রতি বৈষম্য বলতে কি বোঝায়

ধারা-২ রাষ্ট্র সমূহের সংবিধান ও আইন সমূহে নারী-পুরুষের সমতার নীতি অনুসরণ
ধারা-৩ নারীর মানবাধিকার ও মৌলিক স্বাধীনতা নিশ্চিত করণ
ধারা-৪ নারী-পুরুষের সমতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সাময়িক বিশেষ ব্যবস্থা
ধারা-৫ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রথার ইতিবাচক পরিবর্তন
ধারা-৬ নারী পাচার রোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ
ধারা-৭ রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনে নারীর সমান অংশগ্রহণের ব্যবস্থা
ধারা-৮ আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নারীর সমান অংশগ্রহণের ব্যবস্থা
ধারা-৯ নারী এবং তার সন্তানের জাতীয়তা
ধারা-১০ শিক্ষাক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার
ধারা-১১ কর্মক্ষেত্রে নারী-পুরুষের সমান অধিকার
ধারা-১২ নারীর স্বাস্থ্য, পরিবার পরিকল্পনা ও পুষ্টির অধিকার
ধারা-১৩ নারীর জন্য সমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুযোগ সুবিধা
ধারা-১৪ গ্রামীণ নারী
ধারা-১৫ নারীর আইনগত ও নাগরিক অধিকার
ধারা-১৬ বিবাহ ও সকল পারিবারিক বিষয়ে নারী-পুরুষের সমান অধিকার

জাতীয় পর্যায় ঃ

ক) নারী উন্নয়নে প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো ঃ নারীর সমতা, উন্নয়ন ও ক্ষমতা উন্নয়নের লক্ষ্যে জাতীয় অবকাঠামো যেমন- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর, জাতীয় মহিলা সংস্থা ও বাংলাদেশ শিশু একাডেমীর প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করা হবে। পর্যায়ক্রমে দেশের সকল বিভাগ, জেলা, উপজেলা ও ইউনিয়ন পর্যায়ে এসব প্রতিষ্ঠানের প্রশাসনিক কাঠামো বিস্তৃত করা হবে। নারী উন্নয়নের যাবতীয় কর্মসূচী প্রণয়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণের জন্য এ প্রতিষ্ঠান সমুহের ক্ষমতা বৃদ্ধি করা হবে।

খ) জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ (NCWCD) ঃ নারী উন্নয়ন নীতি নির্ধারণ ও উন্নয়ন কর্মসূচী বস্তবায়ন ও পর্যালোচনার জন্য প্রধানমন্ত্রীকে সভাপতি করে ৫০ সদস্য বিশিষ্ট জাতীয় মহিলা ও শিশু উন্নয়ন পরিষদ গঠন করা হয়েছে। এ পরিষদে কার্যপরিধি নিম্নরুপঃ

- আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন মূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন মন্ত্রণালয়, বিভাগ ও সংস্থার উন্নয়ন মূলক কার্যক্রম সংক্রান্ত নীতি প্রণয়ন কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করা।
- শিশুর স্বার্থ ও অধিকার রক্ষা এবং শিশু কল্যাণের নিমিত্তে সার্বিক নীতি নির্ধারণ ও অধিকার সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে প্রয়োজন বোধে নতুন আইন ও বিধি মালা প্রণয়ন এবং বিদ্যমান আইন সমূহের সময়োপযোগী সংশোধন ও পরিবর্তনের জন্য সুপারিশ প্রণয়ন।
- নারী ও শিশু উন্নয়নের প্রণীত কর্মপরিকল্পনার বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন।
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ (সিডে) ও শিশু অধিকার সনদের বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও পরিবীক্ষণ।
- নারীদের আইনগত অধিকার, নারী উন্নয়ন এবং নারীদের নির্যাতন প্রতিরোধ সংক্রান্ত বিষয়াবলী সমন্ধে নীতি প্রণয়ন।

- সকল কর্মক্ষেত্রে নারীদের স্বার্থ সংরক্ষণ, অংশগ্রহন ও তাদের ভাগ্য উন্নয়ন সর্ম্পকে গৃহীত পদক্ষেপ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ।
- পরিষদ ৬ (ছয়) মাস অন্তর সভায় মিলিত হবে।

কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচিগত কৌশল ঃ

- মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় সহ অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থা এবং জেলা, উপজেলা, ইউনিয়ন পর্যায়ের সরকারি-বেসরকারি সংগঠন সমুহ জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়নের জন্য কর্ম-পরিকল্পনা গ্রহন করবে।
- সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার নিজ নিজ কর্ম-পরিকল্পনায় জেন্ডার প্রেক্ষিতের প্রতিফলন ঘটানো হবে। যাতে করে সকল খাতে নারীর সুষম অধিকার ও স্বার্থ সংরক্ষিত হয়।
- সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী বাস্তবায়নের জন্য নির্দিষ্ট সময় সীমা বেঁধে দেওয়া হবে।
- মনিটরিং ও মূল্যায়নের উদ্দেশ্যে সকল কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীর অগ্রগতির নির্দিষ্ট সময় অন্তর পর্যালোচনা করা হবে।
- বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ/সংস্থার কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচীতে যাতে নারী প্রেক্ষিত সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় সে লক্ষ্যে কর্ম-পরিকল্পনা ও কর্মসূচী প্রণয়নকারী কর্মকর্তা বৃন্দ কেপি এটি সি, প্লানিং একাডেমী ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে জেন্ডার উন্নয়ন বিষয়ে যথাযথ প্রশিক্ষন দেওয়া হবে। এ লক্ষ্যে পাঠ্যসূচীতে ও কোর্সে জেন্ডার ও উন্নয়ন সম্পর্কিত বিষয় অর্ন্তভুক্ত করা হবে।
- নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে সামাজিক সচেতনতা কর্মসূচীর উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হবে। এই সচেতনতা কর্মসূচীতে অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে (১) আইনবিধি ও দলিলাদি থেকে নারীর মর্যাদা হানিকর বক্তব্য ও মন্তব্য অপসারণ (২) মন্ত্রণালয় ও সংস্থায় কার্যনির্বাহী, আইন ও বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নীতি নির্ধারক, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার কর্মকর্তা, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা বৃন্দের সচেতনতা এবং (৩) নারী-পুরুষের সম্পর্ক, অধিকার ও নানা উন্নয়ন সংক্রান্ত বিষয়াবলী শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের পাঠ্যসূচীতে অর্ন্তভূক্ত করণ ইত্যাদি বিষয়ের উপর সর্বশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে।
- সমাজের সকল স্তরে বিশেষভাবে প্রানীত এবং সুষ্ঠু অর্থায়নের ভিত্তিতে নারী বিষয়ক সংবেদনশীল করণ কর্মসূচী নিয়মিত ভাবে পরিচালনা করা হবে। এ ব্যাপারে প্রশাসন, বিশেষতঃ আইন প্রয়োগকারী সংস্থা, বিচার বিভাগ এবং সরকারি-বেসরকারি সকল উন্নয়ন সংস্থার কর্মকর্তা কর্মচারীদের বিশেষ দৃষ্টি আর্কষন করা হবে। নারীর প্রতি সংবেদনশীলতা করণ কর্মসূচী সরকারি ও বেসরকারি উভয় ক্ষেত্রে সকল চলতি প্রশিক্ষণ কর্মসূচীতে পর্যায়ক্রমে সমন্বিত করা হবে।

  নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ কর্মসূচীর উপরও বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হবে। বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানকে এ উদ্দেশ্যে সুপরিকল্পিত কর্মসূচী গ্রহন করতে উদ্বুদ্ধ করা হবে। সে সব কর্মসূচীতে সচেতনতা, আইনগত পরামর্শ ও শিক্ষা, শাস্তিমূলক ব্যবস্থা তথা মামলা পরিচালনা করা, মামলা পরিচালনার জন্যে নিরাপদ আশ্রয় ও পুর্নবাসন, আর্থিক সহায়তা ইত্যাদি কার্যক্রম অন্তর্ভূক্ত থাকবে। এ ক্ষেত্রে কমিটি নারী উন্নয়ন সম্পর্কিত কর্মসূচী পর্যালোচনা, সমন্বয় ও মূল্যায়ন করবে। কমিটি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের সংস্থার সমস্যা চিহ্নিত করে ভবিষ্যৎ কর্মসূচী দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য পরামর্শ প্রদান করবে।

জেলা ও উপজেলা ঃ

নারীর অগ্রগতি এবং ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে জেলা পর্যায়ের প্রশাসন, জেলা পরিষদ, পৌরসভা, স্থানীয় সরকার, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের দপ্তর ও এনজিওদের কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন ও নারী উন্নয়ন কার্যক্রমের অগ্রগতি পর্যালোচনা করা হবে। জেলা পর্যায়ে জেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা, নারী উন্নয়ন কল্পে গৃহীত সকল কার্যক্রম বাস্তবায়নে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সমন্বয়ে দায়িত্ব পালন করবে।

তৃণমূল পর্যায় ঃ

তৃণমূল পর্যায়ে গ্রাম ও ইউনিয়নে নারীকে স্বাবলম্বী দল হিসাবে সংগঠিত করা হবে। এ দল সমূহকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে বিভিন্ন সরকারি সংস্থার আওতায় নিবন্ধীকৃত সংগঠন হিসাবে রূপ দেওয়া হবে। সরকারি, বেসরকারি উৎস, ব্যাংক, অন্যান্য আর্থিক সংস্থা থেকে প্রাপ্ত সম্পদ আহরণ করে এ সংগঠন গুলোর সাথে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেলা পরিষদ, জেলা পরিষদ, পৌরসভা ও সিটি কর্পোরেশন সমূহের নিবিড় সম্পর্ক স্থাপন ও সমন্বয় সাধন করা হবে। উপরন্তু তৃণমূল পর্যয়ের সকল সংগঠনের কার্যক্রমের স্থানীয় উন্নয়নের প্রেক্ষিতে অন্তর্ভুক্তির জন্য উৎসাহিত এবং সহায়তা প্রদান করা হবে।

নারী উন্নয়নে এনজিও এবং সামাজিক সংগঠনের সাথে সহযোগিতা ঃ

প্রকৃত নারী উন্নয়ন একটি ব্যাপক কাজ। এই কাজে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগের সমন্বয় ঘটানোর প্রয়াস নেয়া হবে যাতে করে সর্বস্তরের জনগণের অংশগ্রহন নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। বেসরকারি ও সামাজিক সংগঠন সমূহকে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ নেয়া হবে ঃ

ক) গ্রাম, ইউনিয়ন, উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে নারী উন্নয়নে সকল স্তরে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং উন্নয়নে বিশেষ ভূমিকা পালনকারী স্বেচ্ছাসেবী ও সামাজিক সংগঠনগুলোকে সম্পৃক্ত করণ ও তাদের কর্মকান্ডের সাথে সমন্বয় সাধন করা হবে। নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ায় যথোপযুক্ত ভূমিকা পালনের লক্ষ্যে নারীর প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের উদ্দেশ্যে এসব প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় কর্মসূচী গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা হবে।

খ) জাতীয় থেকে তৃণমূল ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষণা পরিচালনার জন্য দক্ষতা বৃদ্ধিতেও ব্যবস্থা নেয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনার জন্য উৎসাহিত করা হবে। পৃথক জেন্ডার গবেষণা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা হবে। সেখান থেকে নীতি নির্ধারকদের প্রয়াজনীয় তথ্য সরবরাহ করা হবে।

নারী ও জেন্ডার সমতা বিষয়ক গবেষণা ঃ

নারী উন্নয়ন ও সমতা বিষয়ে ব্যাপক গবেষনা পরিচালনার জন্যে দক্ষতা বৃদ্ধি ব্যবস্থা নেওয়া হবে। সকল গবেষণা প্রতিষ্ঠানকে নারী উন্নয়ন, ক্ষমতায়ন এবং নারী ও শিশুদের অধিকার সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা পরিচালনায় উৎসাহিত করা। একটি বিশেষ কৌশল হিসাবে মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালায়ের কেন্দ্রীয় নারী ও শিশু নির্যাতন প্রতিরোধ সেলের কর্মপরিধি বিস্তৃত ও শক্তিশালী করা হবে।

আর্থিক অবস্থা ঃ

- তৃণমূল পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ, উপজেল পরিষদ ও জেলা পরিষদে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।

- জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট যথাযথ ভাবে বাস্তবায়ন করা হবে এবং মধ্য মেয়াদী বাজেট কাঠামোর আওতায় তথা রাষ্ট্রীয় বাজেট প্রণয়নের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল বাজেট প্রক্রিয়া (জিআরবি)

অনুসরণ অব্যাহত রাখা হবে। বাজেটকৃত অর্থেও সর্বোত্তম ও যথাযথ ব্যবহার নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ করার কাঠামো শক্তিশালী করা হবে।

- উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহনের ক্ষেত্রে জেন্ডার সংবেদনশীল নীতিমালা অনুসরণ করা হবে।
- জাতীয় পর্যায়ে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব ও উন্নয়ন বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি করা হবে। নারী উন্নয়নে নিয়োজিত মন্ত্রণালয় এবং সংস্থা যেমন- স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায়, শ্রম ও জনশক্তি, কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ে নারী উন্নয়নের জন্য লক্ষ্যমাত্রা ও কর্মসূচী চিহ্নিত করে অতিরিক্ত বাজেট বরাদ্দ করা হবে।
- পরিকল্পনা কমিশন সকল খাতে বিশেষ করে শিক্ষা, গৃহায়ন, পানিসম্পদ, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ, প্রশিক্ষণ, দক্ষতা বৃদ্ধি, কর্মসংস্থান এবং অন্যান্য উপ-খাতে নারী ও পুরুষের জন্য পৃথক ভৌত ও আর্থিক সম্পদ চিহ্নিত করে অর্থ বরাদ্দ করা হবে।
- অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ নারী উন্নয়নে আন্তর্জাতিক উৎস থেকে নতুন ও অতিরিক্ত আর্থিক সহযোগিতা প্রাপ্তির প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহন করা হবে।
- বাণিজিক ব্যাংক, বাংলাদেশ ব্যাংক ও অন্যান্য আর্থিক প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে ক্ষুদ্র উদ্যোক্তাদের আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হবে।

সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সহযোগিতা ঃ

নারী উন্নয়ন নীতি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে তৃণমূল পর্যায় থেকে জাতীয় পর্যায় পর্যন্ত সর্বস্তরের সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সম্ভাব্য সহযোগিতা যোগসূত্র গড়ে তোলা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠান সমূহকে যথোপযুক্ত এবং সময়পযোগী সহায়তা প্রদান করা হবে। সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, বৈঠক/কর্মশালা ইত্যাদির মাধ্যমে এই আদান প্রদান চলবে। ক্ষেত্র বিশেষে সরকারি-বেসরকারি যৌথ উদ্যোগে নারী উন্নয়ন কর্মসূচী গ্রহণ করা হবে।

নারীর ক্ষমতায়ন ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ঃ

নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে দ্বি-পাক্ষিক আর্থিক সহযোগিতা এবং অভিজ্ঞতা ও প্রযুক্তি বিনিময়ের মাধ্যমে আন্তর্জাতিক, আঞ্চলিক ও উপ-আঞ্চলিক সহযোগিতা উৎসাহিত করা হবে।

- নারীর অন্তর্ভুক্তি, তার প্রতি ন্যায্য আচরণ এবং তার নিরাপত্তা নিশ্চিত করা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।
- এর গুরুত্ব আছে নারীর জন্য, তার পরিবারের জন্য, অর্থনীতির জন্য, সর্বোপরি বৃহত্তর সমাজের জন্য।
- কাজের সুযোগ, আইনগত বৈষম্য ও স্বামীর নির্যাতন- এই তিনটি সূচকে বাংলাদেশ কম নম্বর পেয়েছে।
- বেশি নম্বর পেয়েছে পুত্রসন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা ও সংঘবদ্ধ সহিংসতা এই তিনটি সূচকে।
- নারী যখন সমান অধিকার ও সুযোগ পাবে, তখন এই পৃথিবী আরও নিরাপদ, আরও শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হবে।
- সাংবাদিকতা পেশায় এখনো পুরুষের আধিপত্য। গণমাধ্যমে কর্মরতদের বক্তব্য এবং বিভিন্ন গবেষণার তথ্য বলছে, চাকরিচ্যুতি, যৌন হয়রানি সহ বিভিন্ন নির্যাতনের বেশি শিকার হন নারী সাংবাদিকেরা। নীতি নির্ধারণী পর্যায়ে নারীর সংখ্যাও হাতে গোনা। তবে আগের তুলনায় নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বেড়েছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ কিছু প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাসহ নেওয়া হয়েছে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ।
- নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণসহ দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করা বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী দেশে প্রায় ১ (এক) হাজার নারী সাংবাদিকতা পেশায় আছেন।
- বাংলাদেশসহ ১৪৪টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্ট ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছর পর পর প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।
- ২০১৫ শীর্ষক প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ৮৪ শতাংশ পুরুষ আর ১৬ শতাংশ নারী।
- টেলিভিশনে নারী সাংবাদিকদের অর্ধেকের বয়স ১৯ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। গণমাধ্যম, বিশেষ করে টেলিভিশনে ৬৫ বছর বয়সী নারী সাংবাদিক খুঁজেই পাওয়া যায় না। গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্ট-১ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বলেছেন, দেশে গণমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েছে।
- বর্তমানে দেশের প্রায় ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে গড়ে ৪০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। তবে পড়াশোনা শেষ করে কতজন সাংবাদিকতা পেশা বেছে নিচ্ছেন বা বর্তমানে দেশে কত নারী সাংবাদিকতায় আছেন এ ধরনের তথ্য নেই কারও কাছে।
- ২০১৭ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের অধীনে "পেশাদার সাংবাদিকেরা চাকরি নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট, একটি গবেষণা মূল্যায়ন" শীর্ষক গবেষণায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৩৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১০২ জন বা ৩০ দশমিক ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা ছিলেন নারী সাংবাদিক। এই গবেষণায় কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা আছে বলে মনে করেন ১৮ শতাংশ। ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, কর্মস্থলে তাঁদের অবহেলার চোখে দেখা হয়। পুরুষ সহকর্মীদের অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা জানান ৫০ শতাংশ। ১০২ জন নারী উত্তরদাতার মধ্যে ৭ জন জানিয়েছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে কর্মস্থলে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। প্রায় ১০ শতাংশ নারী সাংবাদিক বলেছেন, তাঁরা বর্তমান কর্মস্থলে মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না।

- বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক পারভীন সুলতানা বলেছেন, বেশি কাজ করে নারীরাও পারে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সংসার সামলাতে। তবে কাজের ক্ষেত্রে মূল্যায়নটা সেভাবে হয় না।
- তবে হতাশার মধ্যেও আশার আলো দেখছেন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক। তিনি বলেছেন "আমি ১৯৭৩ সাল থেকে সাংবাদিকতা পেশায় আছি। তখন ১২ থেকে ১৫ জন ছিলাম আমরা। ২০০১ সালে যখন নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়, তখনো নারী সাংবাদিক ১০০ জনে আটকে ছিল আর বর্তমানে তা প্রায় ১ হাজার জনে পৌঁছেছে। টেলিভিশন সাংবাদিকতায় নারীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। নারীরা ফটো ও ভিডিও সাংবাদিকতায় এসেছেন।"
- সর্বোচ্চ প্রচারসংখ্যা নিয়ে শীর্ষে থাকা প্রথম আলোতে ফিচার বিভাগ এবং অনলাইনের ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দুজন নারী। অপরাধ, সচিবালয় বিটে কাজ করছেন নারীরা। নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং নারী ও শিশু বিষয়ে লেখার জন্য নীতিমালা এবং যৌন হয়রানির বিষয়ে জানানোর জন্য একটি কমিটিও কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটিতে। প্রতিষ্ঠানটিতে রিপোর্টিংসহ মোট নারী কর্মীর সংখ্যা ৬৬ জন।
- ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে কর্মরত মোট নারীর সংখ্যা ৫৩ জন। ডেইলি স্টারের উপ-সম্পাদকীয়, বিনোদন, ইংরেজি অনলাইনসহ মোট পাঁচটি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা।
- গত বছর বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি) এবং ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেশন স্টাডিজের এক জরিপে নারী সাংবাদিকদের মধ্যে ১৭ জন লাখ টাকার বেশি মাসিক বেতন পাচ্ছেন (অষ্টম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানে) বলে যে তালিকা দেওয়া হয়, তাতেও ছিলেন প্রথম আলোসহ প্রথম সারির গণমাধ্যমের নারী সাংবাদিকেরা।
- জাতীয় প্রেসক্লাবে সাধারণ সম্পাদক পদে (পর পর দুবার) দায়িত্ব পালন করছেন ফরিদা ইয়াসমিন। রাজধানীতে হেফাজতে ইসলামের সভায় বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক নাদিয়া শারমিন হামলার শিকার হন। পরে এই সাহসিকতার জন্য ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অ্যাওয়ার্ড ফর কারেজ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশি নারীর সম্মাননা পান তিনি।
- ১৯৭৮ থেকে শুরু করে ২০১২ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকতা করেন মাহমুদা চৌধুরী। তিনি বলেছেন, "একসময় নারী সাংবাদিকদের নিয়োগ দিলে কাজের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে বলেও মন্তব্য শুনতে হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে। তবে যে গতিতে চিত্রটা পাল্টানোর কথা ছিল, তা হয়তো হচ্ছে না।"
- মাহমুদা চৌধুরী নারীদের নিয়োগে গণমাধ্যমের নীতি নির্ধারকদের মন মানসিকতায় পরিবর্তন এবং নারী সাংবাদিকদের যাতে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়, সে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেন।
- দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন ভাষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি নারী সাংবাদিকদের নেটওয়ার্কিং বাড়ানো জরুরি বলে উল্লেখ করেন।
- নারী সাংবাদিকদের ধরে রাখতে সব কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানি বিরোধী কমিটি করার পরামর্শ দিলেন নাসিমুন আরা হক।

০৭ নভেম্বর ২০১৯ দুর্যোগে সব সামলান নারী, নাম হয় পুরুষের!

- ঘূর্ণিঝড় আসছে। ১০ নম্বর মহাবিপদ সংকেত। সবাই ব্যস্ত জান বাঁচাতে। আশ্রয়কেন্দ্র বা উঁচু কোনো ভবনে যাচ্ছে তাড়াতাড়ি। কিন্তু আমার মা টিউবওয়েলের হাতলটা খুলে রাখলেন। খোলা মাথাটা পলিথিন দিয়ে ভালো করে ঢেকে দিলেন। কিছু কাঠ-কয়লা এমন জায়গায় রাখলেন যেন জলোচ্ছ্বাসেও ভিজে না যায়। কিছু চাল-ডাল-মাছ বড় বড় হাঁড়িতে রেখে ভালো করে মুখ বন্ধ করে মাটির নিচে সংরক্ষণ করলেন। তখন ঝড়-জলোচ্ছ্বাস শুরু হয়ে গেছে। প্রতিবেশী একজনের হাত ধরে আশ্রয় নিলেন একটা উঁচু পাকা ভবনে।

- সারা রাতের তাণ্ডবে সবকিছু লন্ডভন্ড। সকালে কী খাবে বাসার সবাই? সেই সময় মা এসে ধীরেসুস্থে টিউবওয়েলের হাতলটা লাগিয়ে পানি তুললেন। কাঠ-কয়লা দিয়ে চুলা ধরালেন। ডাল-ভাত রান্না করলেন। এমনকি গরম-গরম মাছভাজাও দিলেন ছেলে ও তার বাবার পাতে। কিন্তু সেই মা কি তখনো খেয়েছেন? কেউ খোঁজ রাখিনি।

- এই বিবরণ সেদিন দিচ্ছিলেন পরিবেশ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এ কে এম রফিক আহাম্মদ। তিনি প্রধান অতিথির বক্তব্য দিচ্ছিলেন প্রথম আলো গোলটেবিল বৈঠকে। মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের সহযোগিতায় আয়োজিত ওই আলোচনা অনুষ্ঠানের বিষয় ছিল জলবায়ু সহনশীলতায় গ্রামীণ নারীর ভূমিকা। রফিক আহাম্মদ তাঁর ছোটবেলার স্মৃতিকথা বলছিলেন। তিনি বললেন ৭০-এর সেই ঘূর্ণিঝড়-জলোচ্ছ্বাসে অনেক মানুষ প্রাণ হারায়। তাঁদের গ্রামের অনেকে সেই সময় দুর্যোগের পর কয়েক দিন অসহায় অবস্থায় ছিলেন। নাওয়া-খাওয়া নেই। থাকার ঘর নেই। কিন্তু মা জানতেন এ ধরনের পরিস্থিতিতে কী করতে হবে। তাই এত বড় জলোচ্ছ্বাসের পরও তিনি তাঁর মায়ের হাতে গরম ভাত-মাছ-ডাল খেতে পেরেছেন। কথাটা তাঁর স্মৃতিতে গেঁথে আছে।

- আমরা কথায় বলি নারীর ক্ষমতায়ন দরকার। এমনকি বলি, এখন নারীর ক্ষমতায়ন অনেকটা এগিয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা নয়। ঘরদোর সামলান নারী। দুর্যোগে সব বিপদ-আপদ থেকে বাঁচার উপায় বের করতে হয় তাঁকেই। আর পরিবারের প্রধান হিসেবে পুরুষের খবরদারিটাই শেষ পর্যন্ত আসল ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সব ক্রেডিট জমা হয় পুরুষের খাতায়। নারীর কাজের মূল্যায়ন হয় না। এভাবে নারীর ক্রেডিট হাইজ্যাক হয়ে চলেছে গ্রামে গ্রামে, ঘরে ঘরে।

- অনেক নারী আজকাল কৃষিকাজ করেন মাঠে। কারণ, পুরুষ হয়তো আধুনিক প্রযুক্তির কল্যাণে ইজিবাইক চালান বা কাছের ইউনিয়ন সদরে দোকানে কাজ করেন। মাঠে কাজ করেন নারী। কিন্তু কৃষি কার্ড পান স্বামী। সেই কার্ডে ঋণ পান তাঁর স্বামী। কারণ, জমি স্বামীর নামে। তাই কৃষি কার্ডও তাঁরই নামে। তাহলে নারীর ক্ষমতায়নটা হলো কীভাবে?

- দুর্যোগের সময় প্রাথমিক ম্যানেজার নারী। এই গুরুত্বপূর্ণ সত্য কথাটি বললেন মানুষের জন্য ফাউন্ডেশনের জেন্ডার অ্যাডভাইজার বনশ্রী মিত্র নিয়োগী। শস্য, জ্বালানি ও স্বাস্থ্য সুরক্ষায় নারীর ভূমিকা অবিকল্প। তাঁর ওপর এত বোঝা, তাও তিনি ঘুরে দাঁড়ান।

- নারীকে সম্মান দিতে হবে। সংসারের কাজ, মাঠের কাজ, চুলায় চোখ পুড়িয়ে রান্নার কাজ, এমনকি ধান বোনা-কাটা-মাড়াই প্রায় সব কাজই করেন নারী। কিন্তু এসব কাজের বেতন পান না বলে তাঁর কাজের স্বীকৃতিও নেই। তাই মর্যাদা পান না। অথচ এই নারীই দুর্যোগে টিকে থাকার আগাম প্রস্তুতি হিসেবে প্রতিদিন একমুঠো করে চাল সংরক্ষণ করেন। পরিবারের আর কার মাথায় এমন বুদ্ধি খেলে?

২৫ জানুয়ারি ২০১৯ নারী আক্রান্ত বেশি নিজ ঘরে

স্বামীর নির্যাতনে হাসপাতালে ভর্তি হতে বাধ্য হয়েছেন হালিমা। ঢাকা মেডিকেলের ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে আছেন। ভালোবেসে পছন্দের পুরুষকেই বিয়ে করেছিলেন। কিন্তু বিয়ের পরই বদলে যেতে থাকেন ভালোবাসার মানুষটি। তুচ্ছ কারণে শরীরে পড়ে উত্তপ্ত চামচের ছ্যাঁকা।

নারী শ্রমিকের আর কত লাশ আসবে?

সাধারণত শ্রমিকদের শ্রম আর কষ্টের কথাটা বুঝাতে শ্রম-ঘাম একটা জুতসই শব্দ। শ্রমে-ঘামে যুদ্ধ করে প্রবাসের শ্রমিকরা দেশে রেমিটেন্স পাঠায়। প্রবাসীদের এ রিমিটেন্স বাংলাদেশের অর্থনীতিকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে রাখে । যদি দেড় কোটি মানুষও বাংলাদেশের বাইরে থাকে, তাহলে কম করে হলেও ৫ থেকে ৬ কোটি মানুষ এই দেড়কোটি মানুষের উপরই নির্ভরশীল থাকেন সরাসরি। এছাড়া আছে রেমিটেন্স, এই রেমিটেন্সের প্রবাহ থেকে আসা রাষ্ট্রীয় আয়। বাস্তবতা হল, এদের প্রায় সবাই-ই দেশে তাদের পরিবার দেখাশোনা করে। বিশেষত মধ্যপ্রাচ্যের প্রবাসীরা দেশটিতে দিচ্ছেন তাদের সর্বোচ্চ অংশ।

আরব আমিরাত, সৌদিআরব তথা মধ্যপ্রাচ্যে বাংলাদেশী ব্যবসায়ী-শিল্পপতিদের সংখ্যা কম নয়। তাদের অনেকেই বাংলাদেশে শিল্প প্রতিষ্ঠানও গড়ে তুলেছেন। উচ্চ চাকুরীজীবীদের সংখ্যাও নেহাত কম নয়, তবে বড় অংকের না। আর সেজন্যে দেখা যায়, আরব আমিরাত-সৌদি আরবে কাজ করা বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রতি ব্যবসায়ী-চাকুরীজীবীদের একটা নাক সিঁটকানো ভাব আছেই। শ্রমিক শ্রেণির মানুষগুলোর সুবিধা আদায়ে কথিত উচ্চশ্রেণির মানুষগুলোর সুযোগ থাকা সত্ত্বেও খুব একটা উদ্যোগী হন না। যারা কিছু কিছু সাহায্য-সহায়তা করে থাকেন, তাদের সংখ্যা অল্প। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর কারণেই শ্রমিকরা বিভিন্নভাবে নির্যাতিত হন। বিচার পাবার অধিকার থাকা সত্ত্বেও তারা আইন-কানুন ঘাটাঘাটি করতে উদ্যোগী হতে পারেন না।

২০১৫ সালে এক চুক্তির পর বাংলাদেশ থেকে নারী গৃহকর্মী পাঠানো শুরু হয় সৌদি আরবে। কিন্তু কিছু দিন যেতে যেতেই নারীদের ফেরত আসা শুরু হয়। শ্রমবাজার সৃষ্টির শুরু থেকেই সে কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল, কিন্তু 'রেমিটেন্স' নামক সোহাগী শব্দের অন্তরালে ঢাকা পড়লো সব কিছুই। একে একে ফিরে আসতে থাকলো নির্যাতিত নারীরা। জমতে থাকল অভিযোগের পাহাড়। এমনকি অনেক নারীকে তাদের বিসর্জিত ইজ্জতের কারণে স্বামী সন্তানরাও তাদের জায়গা দিল না, নিদারুণ বেদনা নিয়ে এই নারীরা কাটাতে থাকলো মানবেতর জীবন

একজন শ্রমিকের অফিস-আদালতে দৌড়ানোর মতো সামাজিক কিংবা অর্থনৈতিক সুবিধাজনক অবস্থান তাদের থাকে না। অন্যদিকে এসব ব্যাপার থেকে শিক্ষিত চাকুরিজীবী শ্রেণি কিছুটা দূরে থাকেন, ব্যবসায়ীরা নিজেদের প্রয়োজনে দেশটির আইন কানুন ঘাটাঘাটি না করে নিজেদের মাঝে থাকতেই পছন্দ করেন। আর

সেজন্যই মধ্যপ্রাচ্যের লাখ লাখ শ্রমিক বিভিন্নভাবেই নির্যাতিত হন, উদয়াস্থ শ্রম দিয়েও ন্যায্য প্রাপ্যটুকু না পাবার বেদনাটুকু আমরা প্রতিনিয়তই দেখি বিভিন্নভাবে। আর সেজন্যই এই মানুষগুলো নির্ভর করে দেশের দূতাবাসগুলোর উপর। দূতাবসগুলোর উপর নির্যাতিত মানুষের অভিযোগ আছে বিস্তর কিন্তু দূতাবাস তাদের রাষ্ট্রীয় সীমাবদ্ধতার কথাও উচ্চারণ করে থাকেন প্রায়ই, কিন্তু সেবা প্রদানে কিছু কিছু গোয়ার্তুমী এই মানুষগুলোর ভোগান্তি বাড়ায়।

অন্যদিকে দেখা যায় তুলনামূলকভাবে শুধুমাত্র বাংলাদেশের শ্রমিকরাই অধিক অর্থ ব্যয় করে করে মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোতে পাড়ি জমায়। প্রায় পাঁচ বছর আগে সৌদিআরবের জেদ্দা এয়ারপোর্টে এক ভারতীয় নাগরিক আলাপচারিতায় বলেছিলেন তিনি তার চাকুরীতে ১১০০ রিয়াল বেতন পান, তার এদেশে আসতে খরচ হয়েছে ভারতীয় রুপীতে লাখ খানেকের মত। অথচ এই একই কাজে বাংলাদেশী একজন নাগরিকের ৫ লাখ টাকা খরচ হয়। একজন ভারতীয় নাগরিক তার সৌদিআরবে আসার খরচ তোলে নেয় এক বছরেই, অথচ আমাদের দেশের একজন নাগরিক ঐ টাকা তুলতে তার দেশে যাবার সময় হয়ে যায়। আমাদের বিদেশ মন্ত্রণালয় এসব ব্যাপারে মনিটরের কথা বলেন প্রায়ই, কিন্তু কার্যত তার প্রতিফলন কতটুকু হয়, তা প্রশ্নই থেকে যায়।

ইউরোপ-আমেরিকার অভিবাসীদের এরকম সমস্যা স্বাভাবিকভাবেই নেই। কারণ শ্রম দিয়ে হোক আর মেধা দিয়ে হোক প্রত্যেকটা মানুষই কোন না কোনভাবে নিজেকে একটা অবস্থানের মাঝে নিয়ে যায় এ দেশগুলোতে। পুরোপুরি নির্ভর হতে হয় না অন্য কারো উপর। অর্থনৈতিক যাঁতাকলে সন্তান-সন্ততি নিয়ে খুব একটা মাথাব্যথার কারণ নেই, এমনকি মহিলারও। শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আবাসন অনেকটা নিশ্চিত থাকে সে দেশগুলোতে। রাষ্ট্রীয় কাঠামোই প্রত্যেকটা নাগরিকের সুরক্ষা দেয়। ইউরোপ-আমেরিকার দেশগুলোতে স্থায়ী আবাস করে নেয়া মানুষগুলো এমনকি খুব একটা দূতাবাসের সমর্থন-সহযোগিতা প্রত্যাশা করে না। কারণ সে দেশীয় আইনই তাকে সুরক্ষা দেয়। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যের আবহটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। এখানে শ্রমিকদের লম্বা লাইন থাকে দূতাবাসের বারান্দায়। অর্থের জন্য আসা মানুষগুলোর সবচেয়ে বেদনাময় জায়গা হল, মাসের পর কাজ করে এরা বেতন পায় না। কারো ভিসার মেয়াদ চলে যায়। অবৈধ হয়ে পুলিশের চাহনী এদের তাড়িয়ে বেড়ায়। কিন্তু তবুও ঐ মানুষগুলোই তার শেষ অর্জনটুকুই স্বজন আর দেশকেই দিয়ে যায় উজাড় করে।

এই দিয়ে যাবার মধ্যে অন্য এক শ্রমবাজার সৃষ্টি হয় বাংলাদেশের জন্য, বাংলাদেশি নারীদের জন্য। ২০১১ সালে প্রস্তাব আসে সৌদি আরব থেকে।বাংলাদেশ থেকে নারী শ্রমিক নিতে চায় তারা। এর অনেক আগ থেকেই সৌদিআরবে এমনকি বাংলাদেশি শ্রমিক নিয়োগ বন্ধই ছিল। ঢালাওভাবে শ্রমিকদের দরজা তারা খুলে দিল না, শুধু নতুন একটা জানালা খুললো নারীদের জন্য। হঠাৎ করে এই জানালা খোলায় আশাবাদী হল বাংলাদেশ। কিন্তু সে কি বাংলাদেশের প্রতি সৌদি আরবের দরদ না-কি অন্য কিছু। সে ইতিহাস ভিন্ন। কারণ ইতিমধ্যে সৌদিআরবের মরুভূমির মাঝে প্রতিষ্ঠিত হওয়া বিরাট বিরাট অট্টালিকার অভ্যন্তর পৃথিবীর শত শত নারীর অশ্রু আর রক্তে ভেসে গেছে। যৌন নির্যাতনে আর পারিশ্রমিক না পাবার বেদনায় হাজার হাজার ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, শ্রীলংকার নারীরা চলে গেছ দেশে, নিজের বাস্তুভিটায়। যৌন নির্যাতন আর ভয়াবহ নির্যাতনের চিহ্ন সইতে পারেনি আমাদের উন্নয়নশীর দেশগুলোও। তাইতো ঐ দেশগুলো সৌদিআরবের সাথে নারী শ্রমিক নিয়োগ চুক্তিগুলোই বাতিল করে দেয়। আর তখন থেকেই সৌদিআরব হন্যে হয়ে বাজার খোঁজে নারীর বাজার। তারা বাজার ঠিকই পায়, স্বল্প পারিশ্রমিকে ২০১৫ সাল থেকে চুক্তি হয় বাংলাদেশের সাথে। সেই থেকেই শুরু। নির্যাতন-নিগ্রহ আর হাহাকারের। ধর্ষণ, অনাহার, বেতন না পাওয়া-সবকিছুই ভাগ্যে জুটতে থাকে বাংলাদেশী নারীশ্রমিকদের।

২০১৫ সালে এক চুক্তির পর বাংলাদেশ থেকে নারী গৃহকর্মী পাঠানো শুরু হয় সৌদি আরবে। কিন্তু কিছু দিন যেতে যেতেই নারীদের ফেরত আসা শুরু হয়। শ্রমবাজার সৃষ্টির শুরু থেকেই সে কথাগুলো উচ্চারিত হচ্ছিল, কিন্তু 'রেমিটেন্স' নামক সোহাগী শব্দের অন্তরালে ঢাকা পড়লো সব কিছুই। একে একে ফিরে আসতে থাকলো নির্যাতিত নারীরা। জমতে থাকল অভিযোগের পাহাড়। এমনকি অনেক নারীকে তাদের বিসর্জিত ইজ্জতের কারণে স্বামী সন্তানরাও তাদের জায়গা দিল না, নিদারুণ বেদনা নিয়ে এই নারীরা কাটাতে থাকলো মানবেতর জীবন।

ফিরে আসার পর ওই নারীরা যৌন নির্যাতনের অভিযোগ জানালেও প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এ বিষয়ে ছিল নিশ্চুপ। সেসময় সৌদি আরব সফর করে এসে সংসদীয় একটি দল দাবিও করেছিল, নারী গৃহকর্মীদের ফেরার কারণ নির্যাতন নয়। ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির তৎকালীন সভাপতি বজলুল হক হারুন বলেছিলেন, 'সৌদি আরবে অবস্থানরত শ্রমিকরা এবং গৃহকর্মীরা বেশ ভাল আছেন। সেখানে নিয়োজিত গৃহকর্মীদের ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞতা, সৌদি খাবার খাওয়ার প্রতি অনাগ্রহ এবং

দেশের থাকার প্রতি অতি আগ্রহকে দেশে ফিরে আসার মূল কারণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।' কি অকাট্য যুক্তি ! রাষ্ট্রীয় বন্ধুত্বের কাছে হার মানতে থাকে নির্যাতিত নারীদের হাহাকার।

হাজার হাজার নারীদের অর্থ খোয়ানো আর সম্ভ্রম হারানোর পর গত মাসে অবশ্য মন্ত্রণালয় আংশিকভাবে স্বীকার করেছে মধ্যপ্রাচ্যের দেশটিতে কাজ নিয়ে যাওয়া নারীরা নানা নির্যাতনের পাশাপাশি যৌন নিপীড়নেরও শিকার হয়েছেন।

এখন সংসদীয় দলের সেই প্রতিনিধি দলকে কি কোন প্রশ্ন করতে পারবে সেই নির্যাতিত শত-সহস্র নারী ? দেশের অর্থ ব্যয় করে সৌদিআরবে না গিয়ে এখানে বসেই খেয়াল খুশিমত একটা প্রতিবেদন দিয়ে দিলেইতো ল্যাটা চুকে যেত। তাহলে প্রশ্ন কি রাখা যায় না, দেশের লাখ লাখ টাকা খরচ করে বিদেশ ভ্রমণ করে তাদের 'অকাট্য যুক্তি'র নামে কেন এই প্রহসন। কেন-ইবা তাদের মিথ্যে তথ্যে নির্যাতিত মানুষগুলোর নির্যাতনকে গুরুত্বই দেয়া হল না, বরং ধর্ষিতা আর নির্যাতিতা নারীদের হেয় করে এদের 'মিথ্যুক' হিসেবেই জাতির সামনে তুলে ধরার চেষ্টা করা হল?

ফিরে আসার এ মিছিল থামছে না, কান্না আর হাহাকারের দীর্ঘশ্বাস আরও ভারী হচ্ছে দিনের পর দিন। বাড়ছে লাশের বোঝা। বেসরকারি সংস্থা ব্রাক এর অভিবাসন কর্মসূচির পরিসংখ্যান অনুযায়ী সৌদিআরবে ধর্ষণসহ নানা ধরনের নির্যাতনের অভিযোগ নিয়ে এবছর ৯০০ জনের মতো বাংলাদেশী নারী গৃহকর্মী দেশে ফেরত এসেছে। উদ্বেগের ব্যাপার হল, এ বছর সৌদি আরব থেকে বাংলাদেশী নারী গৃহকর্মী ৪৮ জনের মৃতদেহ দেশে আনা হয়। তাদের মধ্যে ২০ জনই সৌদি আরবে নির্যাতনের অভিযোগ তুলে আত্মহত্যা করেছেন।

আগেই উল্লেখ করেছি গত মাসে সরকারও এ নির্যাতনের ব্যাপারটাকে আংশিক হলেও স্বীকার করেছে। কিন্তু কথা হল, নারীদের উপর সুনির্দিষ্ট এই অমানবিক নির্যাতনের বিপরীতে দাঁড়াবার কোন মত পদক্ষেপ নিতে পারছে কি সরকার? নারীশ্রমিকদের নিয়ে যে চুক্তি সরকার করেছে, তাতে আপাত দৃষ্টিতে দেশ এবং নারী শ্রমিকের কল্যাণই নিহিত। কিন্তু যে নির্যাতন-পাশবিকতার ক্ষত নিয়ে ফিরছে নারী শ্রমিরা, যে অভিযোগগুলো একের এক জমছে, সে অভিযোগগুলো দিয়েইতো দেশটার শ্রম মন্ত্রণালয়ের সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে। রাষ্ট্রীয় একটা চাপ রাখতে হবে, নির্যাতিত নারীদের (শ্রমিকদের) ক্ষতিপূরণ আদায়ের বিধি-বিধান আনতে হবে। শুধুমাত্র বৈধ-অবৈধতার ধুয়া তোলে মানবিক দিককেতো এড়িয়ে যাওয়া যাবে না। ইউরোপ আমেরিকায় অবৈধ নারী পুরুষের সংখ্যা লাখ লাখ , কিন্তু সেকারণে কোন অবৈধ শরণার্থীকে ধর্ষণ-নির্যাতন করলে সে দেশগুলোর নাগরিকতো পার পাচ্ছেন না। মানবিক জায়গাটাতেই আমাদের হাত দিতে হবে। মানবিক জায়গাটাতে যদি দু'রাষ্ট্র এক হতে না পারে, তাহলে ধর্ষণ-নির্যাতনকে সঙ্গী করে তো একতরফা নারী শ্রমিক রপ্তানি চালু রাখতে পারে না একটা দেশ।

নারীর শান্তিনিরাপত্তা সূচকে বাংলাদেশ

নারীর শান্তি ও নিরাপত্তা সূচকে বিশ্বে বাংলাদেশের অবস্থান তলার দিকে। ১৬৭টি দেশ নিয়ে তৈরি তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২। বাংলাদেশের পেছনে থাকা দেশগুলোর মধ্যে বেশির ভাগ আফ্রিকা মহাদেশের। যুক্তরাষ্ট্রের জর্জটাউন বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট ফর উইমেন, পিস অ্যান্ড সিকিউরিটি এবং নরওয়ের দ্য পিস রিসার্চ ইনস্টিটিউট অসলো যৌথভাবে এই তালিকা তৈরি করেছে। এ বিষয়ে সম্প্রতি তারা ওয়াশিংটন থেকে ‘নারী, শান্তি ও নিরাপত্তা সূচক ২০১৯-২০: নারীর জন্য অন্তর্ভুক্তিমূলক উদ্যোগ, ন্যায্যতা ও নিরাপত্তার মাধ্যমে টেকসই শান্তি অনুসরণ’ শিরোনামের প্রতিবেদন প্রকাশ করেছে। তাদের এটি দ্বিতীয় প্রতিবেদন।তালিকার শীর্ষে আছে নরওয়ে। তালিকার ২ ও ৩ নম্বরে আছে যথাক্রমে সুইজারল্যান্ড ও ডেনমার্ক। সবচেয়ে খারাপ অবস্থায় আছে ইয়েমেনের নারীরা। দেশটির অবস্থান তালিকার ১৬৭ নম্বরে। তার ওপরে আছে আফগানিস্তান (১৬৬) ও সিরিয়া (১৬৫)।নারীর ভালো থাকার বা কল্যাণের তিনটি মৌলিক বিষয়কে প্রতিবেদনে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে: অন্তর্ভুক্তি, ন্যায্যতা ও নিরাপত্তা। এ ক্ষেত্রে মোট ১১টি সূচক ব্যবহার করা হয়েছে। অন্তর্ভুক্তি পরিমাপের সূচক হিসেবে শিক্ষা, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড, নিয়োগ, মুঠোফোন ব্যবহার ও সংসদে প্রতিনিধিত্ব। আইনগত বৈষম্য, পুত্রসন্তানের প্রতি পক্ষপাত ও বৈষম্যমূলক রীতিনীতিকে ন্যায্যতার সূচক হিসেবে দেখা হয়েছে। নিরাপত্তার সূচক ছিল তিনটি: স্বামীর নির্যাতন, সামাজিক নিরাপত্তা ও কাঠামোগত সহিংসতা।

প্রতিবেদনে ১১টি সূচকের নানা ধরনের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে। বৈষম্যমূলক রীতিনীতির উদাহরণ দেওয়ার সময় বলা হয়েছে, বেতনের জন্য নারীদের চাকরি করাকে পাকিস্তানের ৭৫ শতাংশ পুরুষ সমর্থনকরে না। এ বিষয়ে বাংলাদেশ, ইয়েমেন, ইরাক, লিবিয়া ও আফগানিস্তানের অবস্থান কিছুটা ভালো। এই পাঁচটি দেশের ৫০ শতাংশ পুরুষ মনে করে, নারীদের চাকরি করা উচিত নয়| প্রতিবেদনের ব্যাপারে মন্তব্য জানতে চাইলে নারী আন্দোলনের কর্মী ও নারীপক্ষের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা শিরিন হক *প্রথম আলো*কে বলেন,ওপুরো রিপোর্ট ভালোভাবে না পড়ে মন্তব্য করা ঠিক না। বাংলাদেশের অবস্থান ১৪২ বা ১৪৭ হলে কিছু এসে যায় না। প্রতিদিনের সংবাদপত্র ও নিজের জীবনের অভিজ্ঞতায় দেখছি, বাংলাদেশের নারীরা ভালো নেই।তিবেদনের শুরুতে বলা হয়েছে, নারীর অন্তর্ভুক্তি, তার প্রতি ন্যায্য আচরণ এবং তার নিরাপত্তা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর গুরুত্ব আছে নারীর জন্য, তার পরিবারের জন্য, অর্থনীতির জন্য, সর্বোপরি বৃহত্তর সমাজের জন্য। নারী যখন সমান অধিকার ও সুযোগ পাবে, তখন এই পৃথিবী আরও নিরাপদ, আরও শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধিশালী হবে।

বাংলাদেশের পরিস্থিতি

প্রতিটি সূচকের জন্য নির্দিষ্ট নম্বর আছে। ১১ সূচকে বাংলাদেশের মোট নম্বর দশমিক ৬১২। এ ক্ষেত্রে নরওয়ের নম্বর দশমিক ৯০৪ এবংইয়েমেনের দশমিক ৩৫১।ভালো থেকে খারাপড়এভাবে দেশগুলোকে মোট পাঁচটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। সবচেয়ে খারাপের তালিকায় আছে বাংলাদেশসহ ৩২টি দেশ। কাজের সুযোগ, আইনগত বৈষম্য ও স্বামীর নির্যাতনড়ওই তিনটি সূচকে বাংলাদেশ কম নম্বর পেয়েছে। বেশি নম্বর পেয়েছে পুত্রসন্তানের প্রতি পক্ষপাতিত্ব, সামাজিক নিরাপত্তা ও সংঘবদ্ধ সহিংসতাড়এই তিনটি সূচকে। কোনো একটি সূচকেও বাংলাদেশ সবার চেয়ে ভালো করেনি। আবার কোনো একটি সূচকে সবচেয়ে কম নম্বরও পায়নি।

প্রতিবেশী দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে ভালো অবস্থানে নেপাল। দশমিক ৭১৭ নম্বর পেয়ে তালিকার ৮৪ নম্বরে আছে এই দেশ। তালিকায় শ্রীলঙ্কা, মালদ্বীপ ও ভুটানের অবস্থান যথাক্রমে ১০৭, ১১১ ও ১১৮। ভারত ১৩৩ নম্বরে। পাকিস্তান ও আফগানিস্তান আছে তালিকার যথাক্রমে ১৬৪ ও ১৬৬ নম্বরে। অন্য প্রতিবেশী দেশ মিয়ানমারের অবস্থান ১৫০ নম্বরে।

নারীরা এগোচ্ছেন ধীরগতিতে

সাংবাদিকতা পেশায় এখনো পুরুষের আধিপত্য। গণমাধ্যমে কর্মরতদের বক্তব্য এবং বিভিন্ন গবেষণার তথ্য বলছে, চাকরিচ্যুতি,যৌন হয়রানিসহ বিভিন্ন নির্যাতনের বেশি শিকার হন নারী সাংবাদিকেরা। নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নারীর সংখ্যাও হাতে গোনা। তবে আগের তুলনায় নারী সাংবাদিকের সংখ্যা বেড়েছে। প্রথম আলো, ডেইলি স্টারসহ কিছু প্রতিষ্ঠানে নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করাসহ নেওয়া হয়েছে কিছু ইতিবাচক পদক্ষেপ। নারী সাংবাদিকদের প্রশিক্ষণসহ দক্ষতা বৃদ্ধিতে কাজ করা বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, দেশে প্রায় ১ হাজার নারী সাংবাদিকতা পেশায় আছেন। বাংলাদেশসহ ১৪৪টি দেশের তথ্যের ভিত্তিতে ওগ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্ট ২০১৫৺ শীর্ষক প্রতিবেদন বলছে, বাংলাদেশে সাংবাদিকদের ৮৪ শতাংশ পুরুষ, আর ১৬ শতাংশ নারী। টেলিভিশনে নারী সাংবাদিকদের অর্ধেকের বয়স ১৯ থেকে ৩৪ বছরের মধ্যে। গণমাধ্যম, বিশেষ করে টেলিভিশনে ৬৫ বছর বয়সী নারী সাংবাদিক খুঁজেই পাওয়া যায় না। গ্লোবাল মিডিয়া মনিটরিং প্রজেক্ট ১৯৯৫ সাল থেকে প্রতি পাঁচ বছর পরপর প্রতিবেদন প্রকাশ করছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক রোবায়েত ফেরদৌস বললেন, দেশে গণমাধ্যমের সংখ্যা বেড়েছে। বর্তমানে দেশের প্রায় ২০টি বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতা বিভাগে গড়ে ৪০ জন করে শিক্ষার্থী ভর্তি হচ্ছেন। তবে পড়াশোনা শেষ করে কতজন সাংবাদিকতা পেশা বেছে নিচ্ছেন বা বর্তমানে দেশে কত নারী সাংবাদিকতায় আছেনড়এ ধরনের তথ্য নেই কারও কাছে।

২০১৭ সালে প্রকাশিত বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউটের অধীনেওপেশাদার সাংবাদিকেরা চাকরি নিয়ে কতটা সন্তুষ্ট, একটি গবেষণা মূল্যায়ন৺ শীর্ষক গবেষণায় বিভিন্ন গণমাধ্যমের ৩৩৪ জন উত্তরদাতার মধ্যে ১০২ জন বা ৩০ দশমিক ৫৪ শতাংশ উত্তরদাতা ছিলেন নারী সাংবাদিক। এই গবেষণায় কর্মস্থলে নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কা আছে বলে মনে করেন ১৮ শতাংশ। ৫৬ শতাংশ উত্তরদাতা বলেছেন, কর্মস্থলে তাঁদের অবহেলার চোখে দেখা হয়। পুরুষ সহকর্মীদের অসৌজন্যমূলক আচরণের কথা জানান ৫০ শতাংশ। ১০২ জন নারী উত্তরদাতার মধ্যে ৭ জন

জানিয়েছিলেন, তাঁরা বিভিন্ন সময়ে কর্মস্থলে যৌন নিপীড়নের শিকার হয়েছেন। প্রায় ১০ শতাংশ নারী সাংবাদিক বলেছেন, তাঁরা বর্তমান কর্মস্থলে মাতৃত্বকালীন ছুটি পান না।

বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সাধারণ সম্পাদক পারভীন সুলতানা বললেন, বেশি কাজ করেও নারীরাও পারে এটা প্রতিষ্ঠিত করার পাশাপাশি সংসার সামলাতে হয় নারীদের। তবে কাজের ক্ষেত্রে মূল্যায়নটা সেভাবে হয় না।

তবে হতাশার মধ্যেও আশার আলো দেখছেন বাংলাদেশ নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের সভাপতি নাসিমুন আরা হক। তিনি বললেন, আমি ১৯৭৩ সাল থেকে সাংবাদিকতা পেশায় আছি। তখন ১২ থেকে ১৫ জন ছিলাম আমরা। ২০০১ সালে যখন নারী সাংবাদিক কেন্দ্রের যাত্রা শুরু হয়, তখনো নারী সাংবাদিক ১০০ জনে আটকে ছিল, আর বর্তমানে তা প্রায় ১ হাজার জনে পৌঁছেছে। টেলিভিশন সাংবাদিকতায় নারীর উপস্থিতি চোখে পড়ার মতো। নারীরা ফটো ও ভিডিও সাংবাদিকতায় এসেছেন।

সর্বোচ্চ প্রচারসংখ্যা নিয়ে শীর্ষে থাকা প্রথম আলোতে ফিচার বিভাগ এবং অনলাইনের ইংরেজি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন দুজন নারী। অপরাধ, সচিবালয় বিটে কাজ করছেন নারীরা। নারীবান্ধব কর্মপরিবেশ নিশ্চিত করতে এবং নারী ও শিশু বিষয়ে লেখার জন্য নীতিমালা এবং যৌন হয়রানির বিষয়ে জানানোর জন্য একটি কমিটিও কাজ করছে প্রতিষ্ঠানটিতে। প্রতিষ্ঠানটিতে রিপোর্টিংসহ মোট নারী কর্মীর সংখ্যা ৬৬ জন।

ইংরেজি দৈনিক ডেইলি স্টারে কর্মরত মোট নারীর সংখ্যা ৫৩ জন। ডেইলি স্টারের উপসম্পাদকীয়, বিনোদন, ইংরেজি অনলাইনসহ মোট পাঁচটি বিভাগের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন নারীরা।

গত বছর বাংলাদেশ সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট, জার্নালিজম অ্যান্ড কমিউনিকেশন (বিসিডিজেসি) এবং ইনস্টিটিউট অব কমিউনিকেশন স্টাডিজের এক জরিপে নারী সাংবাদিকদের মধ্যে ১৭ জন লাখ টাকার বেশি মাসিক বেতন পাচ্ছেন (অষ্টম ওয়েজ বোর্ড বাস্তবায়নকারী প্রতিষ্ঠানে) বলে যে তালিকা দেওয়া হয়, তাতেও ছিলেন প্রথম আলোসহ প্রথম সারির গণমাধ্যমের নারী সাংবাদিকেরা।

জাতীয় প্রেসক্লাবে সাধারণ সম্পাদক পদে (পরপর দুবার) দায়িত্ব পালন করছেন ফরিদা ইয়াসমিন। রাজধানীতে হেফাজতে ইসলামের সভায় বেসরকারি টেলিভিশনের সাংবাদিক নাদিয়া শারমিন হামলার শিকার হন। পরে এই সাহসিকতার জন্য ইউএস স্টেট ডিপার্টমেন্টের ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অ্যাওয়ার্ড ফর কারেজ পুরস্কারপ্রাপ্ত প্রথম বাংলাদেশি নারীর সম্মাননা পান তিনি।

১৯৭৮ থেকে শুরু করে ২০১২ সাল পর্যন্ত সাংবাদিকতা করেন মাহমুদা চৌধুরী। তিনি বললেন, একসময় নারী সাংবাদিকদের নিয়োগ দিলে কাজের পরিবেশ নষ্ট হয়ে যাবে বলেও মন্তব্য শুনতে হয়েছে। বর্তমানে পরিস্থিতি পাল্টাচ্ছে। তবে যে গতিতে চিত্রটা পাল্টানোর কথা ছিল, তা হয়তো হচ্ছে না।

মাহমুদা চৌধুরী নারীদের নিয়োগে গণমাধ্যমের নীতিনির্ধারকদের মনমানসিকতায় পরিবর্তন এবং নারী সাংবাদিকদের যাতে কাজ করার সুযোগ দেওয়া হয়, সে বিষয়টিতে গুরুত্ব দেন। দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদক তাসমিমা হোসেন ভাষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানোর পাশাপাশি নারী সাংবাদিকদের নেটওয়ার্কিং বাড়ানো জরুরি বলে উল্লেখ করেন। নারী সাংবাদিকদের ধরে রাখতে সব কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানিবিরোধী কমিটি করার পরামর্শ দিলেন নাসিমুন আরা হক।

অধিবেশন-৫
নারীর ক্ষমতায়ণ ও নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুষের ভূমিকা

ক্ষমতায়ন ঃ

ক্ষমতায়ন উন্নয়নের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এটি একটি প্রক্রিয়া যা দ্বারা মানুষ নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে এবং বাধা-বিপত্তি, প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে সচেষ্ট হয়। বিশেষত ক্ষমতায়ন হল সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়া ও বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ এবং প্রভাবিত করার অধিকার, সক্ষমতা ও সুযোগ অর্জন। এর জন্য দরকার জ্ঞান, আত্মসম্মান এবং আত্মবিশ্বাস। অন্য কথায় ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায়- বস্তুগত সম্পদ, মানব সম্পদ, বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ এবং আদর্শিক সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং বাস্তবায়নের ক্ষমতা অর্জন। ক্ষমতায়ন একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া ও সেই প্রক্রিয়ার ফল। অন্য কথায় ক্ষমতায়ন বলতে বোঝায় ঃ

- ✓ বস্তুগত সম্পদ- যেমন জমি, জলাশয় ও বনভূমি ইত্যাদি;
- ✓ মানব সম্পদ- যেমন মানুষ, মানবদেহ, তাদের শ্রম ও দক্ষতা ইত্যাদি;
- ✓ আর্থিক সম্পদ- অর্থ ও অর্থ অর্জনের সুযোগ;
- ✓ বুদ্ধিবৃত্তিক সম্পদ- যেমন জ্ঞান, তথ্য এবং ধারণা ইত্যাদি;
- ✓ আদর্শিক সম্পদ- যেমন একটি নির্দিষ্ট আর্থ-সামাজিক পরিবেশে মানুষ যে উপলদ্ধি করে এবং সক্রিয় হয়;

এই সকল সম্পদের একটি বা সকল সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাই হল ক্ষমতায়ন। ক্ষমতায়ন সম্পদের উপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা ও সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষমতা অর্পণ করে। তাই ক্ষমতায়ন একই সঙ্গে একটি প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার ফল।

ক্ষমতায়ন ও আত্মনির্ভশীলতা বা স্বনির্ভরতা (Self Relience) প্রায়শ ঃ একই অর্থে ব্যবহৃত হলেও এদের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। আত্মনির্ভশীলতার অর্থ বিরাজমান সামাজিক কাঠামোর মধ্যে নিজস্ব উদ্যোগে নিজেদের উন্নয়ন সাধনে মানুষের সক্ষমতা অর্জন। এখানে ধরে নেয় হয় যে, সমাজে কাঠামোগত অসমতা বা বৈষম্য নয়, মানুষের বর্তমান সক্ষমতা বা প্রচেষ্টার ঘাটতি থেকেই উন্নয়ন সমস্যা উদ্ভুত হয়। কিন্তু ক্ষমতায়ন হল ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উভয় পরিকল্পনার ক্ষেত্রেই ক্ষমতা অর্জন করা। অর্থাৎ বিদ্যমান ক্ষমতা সম্পর্ককে প্রশ্নের সম্মখীন করা এবং ক্ষমতা উৎসের উপর অধিকার ও নিয়ন্ত্রণ অর্জনের প্রক্রিয়াকে ক্ষমতায়ন বলে আখ্যায়িত করা হয়।

নারীর ক্ষমতায়ন ঃ

- ❑ আদর্শকে প্রশ্নের সম্মুখীন করা।
- ❑ যে সকল কাঠামো ও প্রতিষ্ঠান নারীর অধঃস্তনতা ও অসমতাকে চিরস্থায়ী করে সেগুলির পরিবর্তন করা।
- ❑ বস্তুগত ও তথ্যগত সম্পদের লাভ এবং এ সবের নিয়ন্ত্রণে নারীকে সক্ষম করে তোলা।

নারীর ক্ষমতায়ন শুধু নারীর ইস্যু নয়, একটি সামাজিক বিষয়। কেননা নারীর ক্ষমতায়নের সুফল পুরুষকেও বস্তুগত ও মনসতাত্বিক মুক্তি প্রদান ও ক্ষমতা অর্পনকে এবং পুরুষদের প্রথাগত নিপীড়ন কারীর ভূমিকা থেকে মুক্ত করে।

নারীর ক্ষমতায়ন কৌশল ঃ

নারীর ক্ষমতায়নের কৌশল হিসেবে দুই ধরণের পদক্ষেপ নেয়া দরকার।

(ক) তাৎক্ষণিক / নৈমিত্তিক সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ;

(খ) কাঠামোগত সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ।

নৈমিত্তিক সমস্যা সমাধানে পদক্ষেপ ঃ

- নারীদের নিজস্ব সংগঠন তৈরী
- সচেতেনতা বৃদ্ধিমূলক কর্মসূচী গ্রহণ (শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রদান)
- ঋণে অভিগম্যতা
- ব্যাপক কর্মসংস্থান ও আয়মূলক কর্মসূচি
- ভোটার শিক্ষা কর্মসূচি

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া ঃ

নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়ার বিবেচ্য দিক সমূহ ঃ

- সচেতনতার স্তর পরিবর্তনের মাধ্যমে ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়া শুরু করা
- বাইরের শক্তি দ্বারা অবশ্যই ক্ষমতায়নের প্রক্রিয়াকে উদ্বুদ্ধ বা উৎসাহিত করণ
- ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া যৌথভাবে শুরু করা
- নারীর ক্ষমতায়ন উপর-নীচ বা এক মাত্রিক হবে না
- নারীর ক্ষমতায়ন প্রক্রিয়া অবস্থা ও অবস্থান পরিবর্তনের জন্য সচেতন করা
- সংগঠিত করা
- আয় ও কর্মসংস্থানমূলক কাজে অংশগ্রহণ
- শিক্ষা গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ
- সামাজিক প্রতিষ্ঠান অভিগম্যতা

নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে পুরুষের ভূমিকা ঃ

- নারী-পুরুষের সম্পর্ক উন্নয়ন
- পুরুষের সাথে সমতার ভিত্তিতে নারীকে উন্নয়নে সম্পৃক্ত করন
- নারী-পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান অসম বা বৈষম্যমূলক সম্পর্ক পুনর্বিন্যাস
- নারীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়ন (যেমন- নারীর পুষ্টি, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, সরাসরি ক্ষমতা, সম্পদ, অধিকার, পছন্দ এবং মর্যাদা ইত্যাদি)
- পারিবারিক কাজে নারীদের সহযোগিতা করা
- নারীদের পাবসস-এর সদস্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়া
- নারীরা যাতে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করে তার ব্যবস্থা নেয়া
- দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নারীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছে কি না তা দেখা
- আয়বৃদ্ধি মূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া ও সহযোগিতা করা। এতে শুধু নারীরই উন্নয়ন হবে না, পরিবারের উন্নয়ন হবে।

মূলধারায় নারী/গুরুত্ব ঃ

নারী-পুরুষের বিদ্যমান বৈষম্য কমানোর জন্য ক্ষমতার অংশীদারিত্ব ও সকল পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহন প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহন করার কথা বলে, সকল নীতি, কর্মসূচি, প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক কার্যক্রম, সাংগঠনিক পদ্ধতি জেন্ডার সমতার ভিত্তিতে পূণঃর্বিন্যাস করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্ব দেয়। বৈষম্য কমানোর ক্ষেত্রে উন্নয়নের মূলধারায় নারীকে নিয়ে আসার কথা বলে। তাই মূলধারায় নারী বিষয়টিকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে ঃ

- মূলধারার (প্রধান) নীতি নির্ধারনী সংস্থা ও ব্যবস্থায় নারীর বিষয়গুলো অন্তর্ভূক্ত করতে বাধ্য করা ;
- নারীদের উন্নয়নের জন্য পর্যাপ্ত অর্থ/সম্পদ বরাদ্দ রাখা, উন্নয়ন প্রক্রিয়া এবং তার ফলাফল ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে সম অংশ প্রাপ্তির জন্য নারীকে সক্ষম করে তোলা ;
- উন্নয়ন ক্ষেত্রে সক্রিয় অংশগ্রহনের জন্য নারীকে সক্ষম করে তোলা ও তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ;
- নারীর উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কর্যক্রম গ্রহনে সরকার, এনজিও ও সকল মূলধারার প্রতিষ্ঠানসমূহকে প্রভাবিত করা ;
- প্রতিষ্ঠানের কর্মসূচি এবং কাঠামোতে নারী উন্নয়নের বিষয় অন্তর্ভূক্ত করা ;
- জেন্ডার সম্পর্ক, নারী ও তাদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় সমূহ উন্নয়ন, উন্নয়ন কর্মসূচি, পরিকল্পনা ও উন্নয়ন মডেলে অন্তর্ভূক্ত করা ;
- সকল পর্যায়ের সিদ্ধান্ত গ্রহনের ক্ষেত্রে নারীকে অন্তর্ভূক্ত করা ;
- নারীকে যাতে সকল কর্মসূচির সহায়ক, ফল ভোগকারী ও ভোক্তা হিসেবে দেখা হয় তা নিশ্চিত করা ;
- প্রতিষ্ঠানের সকল বিভাগ ও অংশই যেন তাদের কাজে জেন্ডার সম্পর্কে বিশ্লেষণ করে তা নিশ্চিত করা ;
- প্রতিষ্ঠানের মূলধারার প্রকল্পসমূহ যাতে জেন্ডার সম্পর্কে বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে কাজ করে তা নিশ্চিত করা ;
- প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী ও বিভাগের মধ্যে জেন্ডার সম্পর্ক ও সে বিষয়ে সচেতনতা তৈরী ও কর্মকান্ডে এর প্রয়োগ নিশ্চিত করার বিষয়ে দায়িত্ববোধ জাগিয়ে তোলা ;
- প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মকান্ডই যেন জেন্ডার সমতা রক্ষার ক্ষেত্রে অবদান রাখে তা নিশ্চিত করা ;

অধিবেশন-৬

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের সুযোগ ঃ

আমরা সামাজিক বিশ্লেষণ করে দেখেছি আমাদের দেশে নারীর অবস্থা ও অবস্থান পুরুষের তুলনায় অধঃস্তন। তাই নারীদের উন্নয়নের জন্য দ্বিতীয় ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্পে বিভিন্ন পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। কারণ মানব জাতির অর্ধেক অংশ রূপে নারী সমাজের উন্নয়ন ব্যতিরেকে জাতীয় উন্নয়ন কখনও পূর্ণাঙ্গতা লাভ করতে পারে না। নারী উন্নয়ন জাতীয় উন্নয়নের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন সেক্টর প্রকল্প উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী নারী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলের অংশগ্রহনের মাধ্যমে প্রথম পর্যায় ১৯৯৬-২০০২ পর্যন্ত ৩৭ টি জেলায়, দ্বিতীয় পর্যায় ২০০২-২০১০ পর্যন্ত ৬১টি জেলায়, ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প-জাইকা ২০০৭-২১১৩ পর্যন্ত এবং তৃতীয় পর্যায় ২০১০-২০১৭ পর্যন্ত ৬১টি জেলায় কার্যক্রম পরিচালনা করছে। উপ প্রকল্প বাছাই হতে পর্যালোচনা, বাস্তবায়ন, পরিচালনা ও রক্ষনাবেক্ষনসহ প্রতিটি স্তরে উপ-প্রকল্প এলাকার উপকারভোগী নারী-পুরুষ সকলের সক্রিয় অংশগ্রহন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নানাবিধ পদক্ষেপ নেয়া হয়ে থাকে। প্রকল্পের গ্রহণযোগ্যতা ও স্থায়িত্বের জন্য উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে বিশেষজ্ঞদের কারিগরী জ্ঞানের পাশাপাশি উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণের অভিজ্ঞতার সমন্বয় সাধন প্রয়োজন। সেক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতাকেও গুরুত্ব দেয়া হচ্ছে যাতে তাদের সমস্যা সমাধানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। শুধুমাত্র নারীর সংখ্যা বৃদ্ধির দিকে নয় সিদ্ধান্ত গ্রহনে ভূমিকা পালনের ক্ষেত্রেও গুরুত্ব দিয়ে স্থানীয় পর্যায়ে যোগ্য নারী নেতৃত্ব গড়ে তোলার ক্ষেত্রেও ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প কাজ করছে। পাশাপাশি এলাকার দুঃস্থ, গরীব ও ভূমিহীন নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য শ্রম বিনিয়োগ ও উপার্জন বৃদ্ধির সুযোগ সৃষ্টি, শ্রম বিনিয়োগে নারী-পুরুষ শ্রমিকদের সমান সুযোগ নিশ্চিত করা, মাটির কাজে নারী-পুরুষের সমান সুযোগ, সামাজিক ও কারিগরি প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দুঃস্থ, গরীব ও ভূমিহীন নারী-পুরুষ উভয়ের সচেতনতা বৃদ্ধি, দক্ষতা উন্নয়ন ও স্বাবলম্বী করাসহ বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়িত হওয়ার উৎসাহ এবং এ লক্ষ্যে বিভিন্ন সুযোগ সৃষ্টি করাও প্রকল্পের উদ্দেশ্য।

নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে প্রকল্পের একটি নিজস্ব নীতিমালা বা কৌশলপত্র আছে। এ লক্ষ্যে প্রকল্পের প্রয়োজনে এলজিইডি ও মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে। এছাড়াও পিছিয়ে পড়া নারীদের অগ্রসর করে নারী-পুরুষের সমতা অর্জনের লক্ষ্যে জেন্ডার বিষয়টি এ প্রকল্পে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে। প্রকল্প চক্রের সকল স্তরেই নারী-পুরুষের অংশগ্রহন নিশ্চিত করার উপর গুরুত্ব দেয়া হয়ে থাকে।

উপ-প্রকল্প চিহ্নিতকরণ ও সম্ভাব্যতা যাচাই ঃ

এই অধ্যায়ে এলাকাবাসীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হয়। উপ-প্রকল্প স্থানীয় জনগণ ও ইউনিয়ন পরিষদ যৌথভাবে চিহ্নিত করে। আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে প্রকল্প চিহ্নিত করার সময় নারীদের অংশগ্রহণ আছে কিনা, তাদের মতামত নেওয়া হয়েছে কি না। অংশগ্রহণমূলক গ্রাম সমীক্ষা (পিআরএ) পদ্ধতিতে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়ন ও প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ঃ

লক্ষ্য রাখতে হবে উপ-প্রকল্পের নকশা প্রণয়নের সময় নারীদের সঠিক অংশগ্রহণ আছে কি না। উপ-প্রকল্প নকশার উপর এলাকাবাসীর সুবিধা অসুবিধা নির্ভর করে। একই ভাবে নারীদের সুবিধা অসুবিধা প্রকল্পের নকশার সাথে সম্পৃক্ত হয়েছে কি না। আমাদের প্রকল্পের অন্যতম লক্ষ্য হচ্ছে দারিদ্রতা হ্রাসকরণ বা এলাকাবাসীদের বর্তমান অবস্থা থেকে আরও ভাল অবস্থায় উন্নীত করা। কোন এলাকার উন্নয়ন সম্ভব না যতক্ষণ পর্যন্ত না সে এলাকার দারিদ্রতা হ্রাস করা হয়। উন্নয়নের জন্য বা দারিদ্রতা হ্রাস করার জন্য কয়েকটি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ

যথা:

১। দরিদ্র মানুষদের সংগঠিত হওয়া।
২। অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজে সম্পৃক্ত হওয়া।
৩। বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করে সুযোগ গ্রহণ করা।
৪। প্রশিক্ষণ গ্রহন করা এবং
৫। নারী পুরুষের অংশগ্রহণ।

নির্মাণ ও প্রথম বছরের রক্ষণাবেক্ষণ ঃ

তৃতীয় অধ্যায়ে নির্মাণ কাজ আরম্ভ হবে। আমাদের এলাকাবাসী এবং পাবসস এর সদস্যদের বুঝাতে হবে, এলাকায় মানুষ যদি গরীব থেকে যায় তাহলে এলাকার দারিদ্যতা হ্রাস পাবে না। এলাকায় কিছু মানুষ আছে যাদের কোন সম্পদ নাই, তাদের কোন দক্ষতা নেই এবং আয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। কিছু নারীরা আছেন যাদের স্বামী নেই বা পঙ্গু, স্বামী পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্তা, যাদের বিশেষ দক্ষতা নেই, লেখাপড়া নেই, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, কয়েক পরিবারের কয়েকজন সদস্য আছেন যাদের ভরনপোষণ তাদের নির্বাহ করতে হয়, তারা গরীব পুরুষের চেয়েও গরীব। কিন্তু এই সকল মানুষের কায়িক শ্রম দেওয়ার ক্ষমতা আছে। পাবসস এর সদস্যদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সকল দুঃস্থ মানুষকে চিহ্নিত করে জানানো যে, প্রকল্পে মাটির কাজে, গাছ লাগানোর কাজ আছে, সেখানে তারা পুরুষদের মত সমান মজুরী পাবে, কাজের সময় বাচ্চা রাখার শেড থাকবে, পানি খাওয়া ও টয়লেটের ব্যবস্থা থাকবে; এতে তাদের কর্মসংস্থান হবে এবং দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।

এলসিএস সদস্যদেরকে উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্য করার ব্যবস্থা করতে হবে। পাবসস'র হিসাবে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভূক্ত করে এলসিএস সদস্যদের প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

পাবসস কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীতে এলসিএস সদস্যদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (সমবায়, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন, মহিলা, যুব উন্নয়ন, সমাজসেবা, স্বাষ্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, এলাকার বাণিজ্যিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

মানুষ দু'ভাবে জীবন যাপন করতে পারে। একটি পথ হচ্ছে প্রচলিত সকল প্রথা, ঐতিহ্য আইন কানুন ও নিয়ম নীতিকে কোনো প্রশ্ন না করে গ্রহণ ও বার বার অনুসরণ করা এবং এগুলোকে অব্যাহতভাবে চলতে দেয়া।

অন্য উপায়টি হলো, আমরা যে সকল ঐতিহ্য বা প্রথা অনুসরণ করি তার যথার্থতা নিয়ে ভাবা। আমরা কি এসব বহুদিন ধরে পালিত হয়ে আসছে বলেই পালন করি, নাকি আমরা কোনো একটি প্রথা ও ঐতিহ্যকে অনুসরণ করি এ জন্য যে এতে সমাজের সবার মঙ্গল ও উপকার সাধিত হয়।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পে নারীর অংশগ্রহণের জন্য গৃহীত পদক্ষেপ সমূহ ঃ

ক) নারীর অবস্থা বা বাস্তবমূখী চাহিদা পূরণ করার জন্য প্রকল্প যে পদক্ষেপ নিয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১। কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করেছে, এলসিএস-এ এক তৃতীয়াংশ নারী নিয়োগের মাধ্যমে।
২। নারীকে গাছ লাগানো, গাছের যত্ন, রাস্তা, বেড়ী বাঁধ নির্মাণ ও মেরামত কাজে অন্তর্ভুক্ত করে।
৩। আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে অন্তর্ভুক্ত করে (কৃষি কাজ, শাক সবজি চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ইত্যাদি)।
৪। খাল খনন, বাঁধ নির্মাণ ও স্লুইচ গেইট নির্মাণ করে তাদের এলাকার কৃষি ও মৎস্য চাষ উৎপাদন বৃদ্ধির মাধ্যমে।
৫। বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণে অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে যেমন- কৃষি, মৎস্য চাষ, ঋণ কার্যক্রম, নেতৃত্ব, সমবায় আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড।

খ) নারীর অবস্থান বা কৌশলগত চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা হচ্ছে ঃ

১। এলসিএস এর নেতৃত্বে নারীকে সভাপতি ও সেক্রেটারী পদে অন্তর্ভুক্ত করে।

২। এলসিএস এ নারীদের সম মজুরী প্রদানের মাধ্যমে।

৩। পাবসস এ ব্যবস্থাপনা কমিটিতে এক তৃতীয়াংশ পদে নারীকে অন্তর্ভুক্ত করে।

৪। পাবসস এর বিভিন্ন উপ-কমিটিতে এক তৃতীয়াংশে নারী অন্তর্ভুক্ত করে ।

৫। পাবসস এর বিভিন্ন মিটিং এ নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে।

৬। প্রকল্পের চক্রের বিভিন্ন পর্যায়ে, প্রকল্প চিহ্নিতকরণ, সম্ভাব্যতা যাচাই, বাস্তবায়ন, পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়নে অংশগ্রহণ ও মতামত প্রদানের মাধ্যমে।

গ) পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটির নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির সকল সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা

২। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কমিটির বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা

৩। বাঁধ, খাল এবং অবকাঠামোসহ সংশ্লিষ্ট যে কোন কাজ তদারকি করা

৪। অবকাঠামোর কাছাকাছি কোন মহিলা সদস্যের বাসস্থান হলে, বর্ষাকালে অবকাঠামোর অবস্থা ও পানির উচ্চতা পর্যবেক্ষণ করা এবং তা কমিটিকে জানানো (সম্ভব হলে প্রতিবেদন তৈরী করা কিংবা তৈরীতে সহায়তা করা)

৫। কোন মহিলা সদস্যের বাসস্থান যদি কোন অবকাঠামোর কাছাকাছি হয় এবং অবকাঠামোটি যদি নিয়ন্ত্রণযোগ্য হয় তা হলে তা পরিচালনা করা, যেমন- স্লুইস গেইটের কপাট খোলা ও বন্ধ করা।

৬। অবকাঠামোসমূহে কোন প্রকার ত্রুটি আছে কিনা তা চিহ্নিত করা, যেমনঃ কোন লিক বা ছিদ্র আছে কিনা।

৭। পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ তহবিলের জন্য উপকারভোগীদের নিকট থেকে অনুদান সংগ্রহ করা।

৮। সাধারণ সভাসহ যে কোন সভার মাধ্যমে পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ বিষয়ে পাবসস সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা।

৯। পাবসস বা প্রকল্পে আয়োজিত পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ কিংবা নারী ও জেন্ডার বিষয়ে যে কোন সভা/ প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা।

ঘ) পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির নারী সদস্যদের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

১। পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির সকল সভায় নিয়মিত অংশগ্রহণ করা।

২। পাবসস ব্যবস্থাপনা কমিটির বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়নের সময় সক্রিয় অংশগ্রহণ করা।

৩। সমিতির যে কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় মতামত পেশ করা, যেমনঃ সমিতির সাপ্তাহিক বা মাসিক চাঁদা বা শেয়ার নির্ধারণ করা।

৪। নারী সদস্য বাড়ানোর ব্যাপারে সহযোগীতা করা, যেমনঃ এলাকার নারীদেরকে সমিতির উপকারীতা সম্পর্কে বুঝানোর মাধ্যমে নতুন সদস্য হতে উদ্বুদ্ধ করা।

৫। সাধারণ সভাসহ যে কোন সভার মাধ্যমে পাবসস সদস্যদের সচেতনতা বৃদ্ধি করা, যেমন- সমিতিতে নিয়মিত শেয়ার সঞ্চয় জমা দিয়ে নিজ নিজ মূলধন বাড়ানো এবং তা দিয়ে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ শুরু করা।

৬। যে কোন প্রশিক্ষণের জন্য প্রশিক্ষণার্থী নির্বাচনের সময় নারী সদস্যদের সুযোগ দেয়ার ব্যাপারে উদ্যোগ নেয়া এবং উক্ত বিষয়ে গুরুত্ব দেয়ার জন্য কমিটির অন্যান্য সদস্যদেরকেও উদ্বুদ্ধ করা।

৭। পাবসস বা প্রকল্প আয়োজিত ব্যবস্থাপনা বিষয়ক কিংবা নারী ও জেন্ডার বিষয়ক যে কোন সভা/ প্রশিক্ষণ/ কর্মশালায় অংশগ্রহণ করা।

পাবসস বা প্রকল্পের আওতায় এলাকাবাসীদের জেন্ডার বিষয়ে সচেতন করা ঃ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণের সার্বিক উন্নয়নে কাজ করে। যদিও কৃষিক্ষেত্রে এর ব্যাপক প্রভাব পড়ে তথাপি সকল জনগণের উন্নয়নকে গুরুত্ব দেয়া হয়। বিশেষ করে, দুঃস্থ ও গরীব মানুষের জন্য কর্মসংস্থান কিংবা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের ক্ষেত্রে উৎসাহিত করা হয়। যেসব দুঃস্থ ও গরীব নারীরা অসহায় জীবনযাপন করে তাদেরকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে একজন নারী তথা একটি পরিবারের মঙ্গল সাধন হতে পারে। সব কাজে দুঃস্থ নারীদেরকে নিয়োগ দেয়া না গেলে তাদের জন্য মাটির কাজ, গাছ লাগানো ও যত্ন নেওয়ার মতো কাজসমূহ বরাদ্দ দেয়া হয়ে থাকে যা করতে তাদের প্রতিবন্ধকতা তুলনামূলক ভাবে কম। অতীতেও এ ধরণের কাজে নারীদের নিয়োগ দেয়ার মাধ্যমে পরিবারের জন্য আয়বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয়েছে এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাস্তব ভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

উপ-প্রকল্প বাস্তবায়নের বিভিন্ন পর্যায়ে উপ-প্রকল্পের স্বল্প ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল সমূহের সাথে প্রকল্প এলাকার নারীদের অধিকতর সম্পৃক্তি ঘটানোর লক্ষ্যে উদ্বুদ্ধকরণ প্রক্রিয়ায় তাদের সংগঠিত করা হয়। তাদের আর্থ-সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা ও অবস্থান অনুযায়ী বিভিন্ন কৌশল গ্রহণ করে উক্ত কাজে তাদের আগ্রহ ও উদ্দীপনা বাড়ানোর লক্ষ্যে কাজ করা হয়। যেমন- প্রয়োজনে বিশেষ করে উপ-প্রকল্প পরিকল্পনা, উপ-বিধি প্রণয়ন ও পাবসস গঠনকালীন সময়ে শুধুমাত্র নারীদের সাথে আলাদা মিটিং/সভা করা এবং নারীদের সমস্যা চিহ্নিত করা ও সমস্যা সমাধানের উপায় খুঁজে বের করার জন্য সহযোগীতা করা। পাবসস-এর বিভিন্ন সভায় আলোচনার মাধ্যমে চিহ্নিত সমস্যা সমাধানের পদক্ষেপ নিতে হয়। তাছাড়া নারীর কার্যকরী অংশগ্রহণ নিশ্চিত করতে সমিতির সাপ্তাহিক সভা, সাধারণ সভাসহ যে কোন সভায় নারীর প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে কমিটি এবং কর্মীকে তৎপর হতে হয়। পরবর্তীতে নারী সদস্যদের সংখ্যা যখন বেড়ে যায় তখন নিয়মিত মিলিত হবার সুবিধার্থে গ্রামভিত্তিক ছোটদল বা উপ-কমিটি গঠন করা হয়ে থাকে। তবে ছোটদল বা উপ-কমিটির মিটিং ছাড়াও যেন সকল নারী সদস্যরা এক সাথে মিলিত হতে পারে সেজন্য বাৎসরিক নারী সম্মেলন করা যেতে পারে। আর নারী সম্মেলন করার জন্য ৮ই মার্চ (বিশ্ব নারী দিবস) কিংবা ২২শে মার্চ (বিশ্ব পানি দিবস) এই দুইদিনের যে কোন একটিকে বেছে নেয়া যেতে পারে।

নারীদের জন্য আলাদা মিটিং বা সভা করতে হলে কিংবা যেসব মিটিং বা সভায় নারীদের উপস্থিতি বাঞ্ছনীয় সেক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হয়।

১) যে কোন মিটিং বা সভার স্থান নারীদের জন্য উপযোগী হতে হবে, যেমন- খোলা মাঠে নয়, মসজিদ বা অন্য কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে নয়, বাজার বা তৎসংলগ্ন স্থানে নয়। কারণ সাধারণতঃ বিভিন্ন কারণে গ্রামীন নারীরা এসব স্থানে যায় না কিংবা যাওয়ার অনুমতি পায় না।

২) যে কোন মিটিং বা সভার দিন/তারিখ নারীদের জন্য উপযোগী হতে হবে, যেমন- জুম্মার দিন কিংবা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠানের দিনে নয়, স্থানীয় হাটবারে নয়, কারণ সাধারণতঃ গ্রামীণ নারীরা পারিবারিক বিশেষ জরুরী কাজ ছাড়া এসব দিনে নিজ-বাড়ীর বাহিরে যায় না কিংবা যাওয়ার অনুমতি পায় না।

৩) যে কোন মিটিং বা সভার সময় নারীদের জন্য উপযোগী হতে হবে, যেমনঃ খুব সকালে কিংবা সন্ধ্যায় নয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাদের জন্য উপযোগী সময় হলো সকাল **১১**টার পরে এবং বিকাল **৩**টার পরে তা হলে সংসারের কাজ সামলিয়ে তারা মিটিংয়ে আসতে পারে। তবে স্ব স্ব এলাকার চাহিদা অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করা বাঞ্ছনীয়।

ব্যবস্থাপনা কমিটিসহ বিভিন্ন উপ-কমিটিসমূহে নারী সদস্য অন্তর্ভুক্তি করার মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা প্রয়োজন। সে লক্ষ্যে ***"প্রথম ব্যবস্থাপনা কমিটি"*** ও ***"পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উপ-কমিটি"***তে এবং ***কমিটির গুরুত্বপূর্ণ পদে*** কমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ নারী সদস্যের অর্ন্তভুক্তি বাধ্যতামূলক। নারী সদস্যদেরকে সমিতি

ও প্রকল্প সংক্রান্ত সকল প্রকার তথ্য সময়মত জানানো এবং তাদের সাথে মতামত বিনিময়-এর মাধ্যমে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা উচিত। পাবসস এবং ব্যবস্থাপনা কমিটির নিয়মিত ও জরুরী সকল বৈঠক বা সভায় উপস্থিতি এবং আলোচনায় সহায়তা করার ক্ষেত্রে নারীরা ভূমিকা রাখতে পারবে। ব্যবস্থাপনা কমিটির সদস্য হিসাবে তাকে সব সময় যে কোন বৈঠক, সভা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে নারীদের উপস্থিতির দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে এবং উপস্থিতি কম দেখতে পেলে সে বিষয়ে তাৎক্ষনিকভাবে জেনে নিতে হবে যে নারীদের উপস্থিতি কম হওয়ার কারণ কি? নারীদের উপস্থিতি কম হওয়ার সাধারণ কারণসমূহ হতে পারেঃ ১) নারীদেরকে মিটিং বা প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করার জন্য তালিকাভুক্ত করা হয় নাই, ২) কিংবা তালিকাভুক্ত করা হলেও দাওয়াত দেয়া হয় নাই, ৩) কিংবা দাওয়াতপত্র অনেক দেরীতে পাঠানো হয়েছে বলে তারা আসতে পারে নাই। যে কোন কারণই থাকুক না কেন সেটা পরিষ্কারভাবে জেনে নিয়ে সে বিষয়ে সিএকে দিয়ে আরও খোঁজ খবর নিতে হবে এবং কোন সমস্যা থাকলে তা দূরীভূত করার জন্য প্রচেষ্টা নিতে হবে এবং পরবর্তী সকল বৈঠক, সভা, প্রশিক্ষণ ইত্যাদিতে নারীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করার উদ্যোগ নিতে এবং সমিতিকে উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করতে হবে। এমন কিছু বিষয় রয়েছে যেটা শুধুমাত্র নারীদের থেকে জানলেই বাস্তবমুখী হবে এবং নারীদেরকেই জানানোর প্রয়োজন। যেমনঃ নারীদের সাথে যে কোন সভা বা মিটিং করতে হলে দিনের কোন সময়টা বেশী উপযোগী, সপ্তাহের কোন দিনে হলে সুবিধা হবে, সভার স্থান কোথায় হলে সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, ইত্যাদি।

প্রকল্পের মাধ্যমে নারীদের জন্য প্রশিক্ষণ ঃ

প্রশিক্ষণ হতে পারে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক অথবা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ। এমন কিছু বিষয় রয়েছে যাতে নারীরা আগে থেকে সুযোগ পায়নি বলে দক্ষ হতে পারেনি। তাই তাদের জন্য আলাদা ভাবে সেসব বিষয়ের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়টি বিবেচনা করা যুক্তিযুক্ত, যেমন- নেতৃত্বের বিকাশ, সভা পরিচালনা, সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় নারীর অংশগ্রহণের প্রয়োজনীয়তা ইত্যাদি। এছাড়া নারীদের ক্ষমতায়নের জন্য আর্থ সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদেরকে আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে জড়িত করা জরুরী। আর সে উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রচলিত কাজে এবং নতুন ধরণের কাজেও তাদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন। তবে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে বিষয় নির্ধারণ করা বাঞ্চনীয়। এক্ষেত্রে ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প থেকে পানি বা পানির সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণের উদ্যোগ নেয়া হয়। যেমন- পুকুরে মাছ চাষ, মাছের পোনা উৎপাদন, মৌসুমী শাক-সবজি উৎপাদন, বীজ উৎপাদন, বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি। তবে জনগণের সংগঠন হিসাবে সমবায় সমিতি যে কোন বিষয়কে বেছে নিয়ে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে পারে। এতে প্রকল্প থেকে কোন বাধ্যবাধকতা নাই। সমিতি ঋণ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করতে পারে এবং ঋণ নিয়ে যে কোন আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার অধিকার ঋণ গ্রহীতার থাকবে।

প্রকল্পের কাজে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচীর ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে। যেমন- নারীদের জন্য শাক সবজি ও বীজ উৎপাদন বিষয়ক প্রশিক্ষণ, উন্নত পানি ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সমন্বিত খামার উন্নয়ন, পুকুরে মাছ চাষ, বসতভিটায় সবজি চাষ, হাঁস মুরগী পালন ও টিকাদান, পরিবেশগত সচেতনতাবৃদ্ধি, খামার ভিত্তিক আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড এবং বীজ উৎপাদন ও প্রক্রিয়াজাতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণ ইত্যাদি। বিভিন্ন উপ-প্রকল্প তথা পাবসস এর মূলধন ও নারী সদস্য সংখ্যা সন্তোষজনক হওয়ার পরেই এই ধরনের প্রশিক্ষণ বা কর্মসূচী হাতে নেয়া হয়েছে। এছাড়া দুঃস্থ নারীদেরকে পাবসস এর মূলধন থেকে স্বল্প সুদে ঋণ দেয়ার সুযোগ সৃষ্টি করা হয়েছে। ফলে নারীরা বিভিন্ন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড শুরু করেছে এবং পরিবারের জন্য বাড়তি আয় করার মাধ্যমে পরিবারে ও সমাজে নিজেদের কর্ম দক্ষতা ও যোগ্যতা প্রমাণ করতে সক্ষম হচ্ছে। প্রকল্পের একটি অন্যতম প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে গ্রামীন পুরুষ ও নারী বিশেষ করে যারা দুঃস্থ, ভূমিহীন এবং প্রান্তিক চাষী তাদের আর্থ সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন করা।

অভিজ্ঞতা থেকে দেখা গেছে যে, সাধারণতঃ নারীরাই বাড়ী ভিত্তিক খামার ব্যবস্থাপনার দায়িত্বে থাকেন। তারা যদি সে বিষয়ে উন্নত কোন প্রশিক্ষণ পান তাহলে নারীরা খুব ভাল এবং প্রশংসনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করতে পারেন এবং অবদান রাখতে পারেন। যাদের বাড়ীতে নিজস্ব বা অংশীদারিত্বের পুকুর আছে তাদেরকে যদি মাছ চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ দেয়া যায় তাহলে মাছ উৎপাদন করে তারা পরিবারের পুষ্টি চাহিদা পুরণের পাশাপাশি আয়

বৃদ্ধি করতে পারেন। এতে করে হাঁস বা মুরগীর খাবার অপচয় রোধ করা যাবে আবার মাছের খাবারও কম লাগবে। পুকুর পাড়ে সবজি লাগালে তা খুবই ভাল হয় এবং ফলনও অধিক পাওয়া যায়। সবকিছু একই জায়গাতে হওয়াতে দেখাশুনা বা পরিচর্যা করতেও সময় কম লাগে। আর এই ধারণাকেই বলা হয় সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনা যার মাধ্যমে কম জমি/সম্পদ থেকে স্বল্প সময়ে অধিক লাভবান হওয়ার সুযোগ থাকে। তবে যাদের বাড়ীর আঙিনায় যথেষ্ট জায়গা থাকে তারা সেখানেও শাক-সবজি চাষের জন্য ব্যবস্থা নিতে পারেন। অনেকের হাঁস-মুরগী পালনের জন্য আগে থেকেই সুন্দর ব্যবস্থা থাকতে পারে তারা প্রয়োজনে সেটাকে বাড়াতে পারেন। যেহেতু গ্রামের অনেক বাড়ীতেই পুকুর থাকে আর বেশীরভাগ নারীরা বাড়ীতেই অবস্থান করেন কিংবা বাড়ীর কাজেই বেশী সময় দেন সেহেতু সমন্বিত খামার ব্যবস্থাপনায় নারীরাই উন্নতি করতে পারেন যার অনেক বাস্তব উদাহরণও রয়েছে।

নারীদের জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ ঃ

গ্রামীণ দুঃস্থ নারীদের কর্মসংস্থানের সুযোগ খুবই সীমিত। বিশেষ করে যাদের নির্দিষ্ট কোন কাজের দক্ষতা নেই তাদের জন্য কাজের যেমন অভাব তেমনি তারা যে কাজ করে সে কাজে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ন্যায্য মজুরি থেকেও হয় বঞ্চিত। এটা নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ, যা কখনই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। তবে শুধুমাত্র দুঃস্থ নারীরাই যে অসহায় জীবন-যাপন করে তা নয়, ক্রমান্বয়ে নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত নারীরাও দারিদ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই তাদেরকে নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসেছে। সে লক্ষ্যেই জেন্ডার সংবেদনশীল দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তন আনা জরুরী। নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করার লক্ষ্যে তাদেরকে কৌশলগত চাহিদা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতা অর্জনও সম্ভব হবে।

এই প্রকল্পটি উপ-প্রকল্পসমূহের কর্ম এলাকার সমগ্র কমিউনিটি তথা জনগণকেই উপকৃত করবে যা আপনা আপনি নারীকে অন্তর্ভুক্ত করার কথা। কিন্তু দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতা ও আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপট থেকে দেখা গেছে যে, নারী সকল সমাজেই পুরুষের অধঃস্তন। সুতরাং লক্ষ্য হওয়া উচিৎ যেন এই বৈষম্য ও অধঃস্তনতা বিলুপ্ত হয়। আবার দরিদ্রদের মধ্যে দরিদ্রতমকে সহযোগীতা করা আমাদের লক্ষ্য। দরিদ্র নারীরা বিশেষভাবে পিছিয়ে আছে। সুতরাং সেইসব নারীদেরকে সহযোগীতা করা অগ্রাধিকারযোগ্য। উন্নয়নের সকল দিকই নারী এবং পুরুষকে ভিন্নভাবে প্রভাবিত করে, সেজন্য সকল দিকেই আলাদাভাবে নজর দিতে হবে। সত্যিকার উন্নয়নের লক্ষ্য হবে নারীদেরকে তাদের নিজেদের জীবনের অর্থবহ পরিবর্তনে যোগ্য করে তোলা। আর তাই নারীদের জন্য গৃহীত সকল প্রকল্পেই আয়ের ব্যবস্থা থাকতে হবে। এই প্রকল্পে সরাসরি আয়ের সুযোগ আছে এমন কাজ সীমিত। প্রকল্পের শুরুতে চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দল যারা মূলত মাটি কাটার কাজ করে, তারাই সরাসরি আয় করতে পারে বা নগদ টাকা পায়। কিন্তু পুরুষ এবং নারী শ্রমিক সমান মজুরি পায় কিনা সেটা প্রকল্প থেকে লক্ষ্য রাখতে হয়। কারণ নারী শ্রমিকদেরকে সমান মজুরী দেয়ার ব্যাপারে ঠিকাদারি/মালিক/সর্দার প্রত্যেকেরই দ্বিধা থাকে। তাই এই প্রকল্প চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের মাধ্যমে নারী পুরুষ প্রত্যেকে ন্যায্য মজুরি দেয়ার লক্ষ্যে কাজ করছে।

এলজিইডি'র জেন্ডার সমতা কৌশল-এ বলা হয়েছে যে, মাটির কাজে নারী শ্রমিক নিয়োগ বৃদ্ধি করুন এবং দৈনিক সমান মজুরি নিশ্চিত করুন। প্রয়োজনে কর্মসূচী রিভিউ করুন এবং সে অনুযায়ী কার্যক্রম বাস্তবায়ন করুন। চুক্তিবদ্ধ শ্রমিক দলের চুক্তিপত্র এমনভাবে তৈরী করুন যেন নারী পুরুষের সম-নিয়োগ এবং সমান মজুরি নিশ্চিত করা যায়। এখানে যে বিষয়টি লক্ষণীয় সেটি হলো- চুক্তিপত্র শ্রমিক দল হচ্ছে এই প্রকল্পের মাধ্যমে একটি গুরুত্বপূর্ণ কর্মসংস্থানের সুযোগ, যেখানে শ্রমিক নিয়োগ ও মজুরি প্রদানে প্রকল্প সরাসরি ভূমিকা রাখতে পারে। বিশেষ করে নারী শ্রমিক যখন পুরুষের সাথে একসঙ্গে কাজ করে, তখন যেন সমান কাজে সমান মজুরি পায় সে বিষয়টিও খেয়াল রাখতে হয়। মনে রাখতে হবে, একই দলের সকল পুরুষ সম-পরিমাণ মাটি কাটতে পারে না কিন্তু তারা (সকল পুরুষ শ্রমিক) সমান হারে মজুরি পায়। সুতরাং যখন নারী ও পুরুষ একসঙ্গে কাজ করে তখনও নারীদের মজুরি পুরুষের মতো সমান হারেই হতে হবে, তা না হলে সেটা হবে নারীর প্রতি অবিচার। কারণ একই রকম কাজের জন্য পুরুষের সমান মজুরি পাওয়ার অধিকার একজন নারী শ্রমিকের

আছে। তাছাড়া সে তো টাকা তার পরিবারের জন্যই খরচ করবে। অনেক গরীব নারী নিজেই পরিবার চালায় ও সংসারের সকল খরচ বহন করে। আমাদের বিভিন্ন সমিতির নারী সদস্যরাও উপরোক্ত বিষয়সমূহ সম্পর্কে বিভিন্ন সময়ে এ ধরনের মতামত দিয়েছেন।

এই প্রকল্প শ্রমিকদের শুধুমাত্র কাজে নিয়োগকে গুরুত্ব দিচ্ছে না, পাশাপাশি তাদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে কাজের গুণগতমান বজায় রাখতে উদ্বুদ্ধ করছে এবং তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের জন্য পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্য হওয়ার বিষয়ে সহযোগিতা করছে। পানি ব্যবস্থাপনা সমিতির সদস্য হিসেবে ভবিষ্যতে তারা নিজেদের শেয়ার ও সঞ্চয় বৃদ্ধির মাধ্যমে আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতে পারবে। একই শ্রমিকদলকে ভবিষ্যতে গাছ লাগানো ও গাছ পাহারাদার হিসেবে কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা করা যেতে পারে। তবে নারীর সাথে সংশ্লিষ্ট সব বিষয়ে নারীর মতামতকে গুরুত্ব দিতে হবে কারণ নিজের ভাল-মন্দ বোঝার অধিকার নারীদের রয়েছে।

নারীর ক্ষমতায়ন এবং নারীদের জন্য আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সুযোগ ঃ

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প দারিদ্রতা হ্রাসকরণকে সামনে রেখে জনগণকে একত্রিত করে পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি গঠন করার প্রয়াস নিয়েছে।

তাই আমাদের উচিত সংগঠন গঠন করে সকল নারী ও পুরুষ একত্রিত হয়ে নিজেদের এবং এলাকার ভাগ্য উন্নয়নের চেষ্টা করা। প্রত্যেক এলাকায় অর্ধেক জনগোষ্ঠি পুরুষ ও অর্ধেক নারী। এলাকার নারীদের বাদ দিয়ে দারিদ্রতা হ্রাস করা সম্ভব নয়। তাই উপ-প্রকল্প এলাকার নারীদের উদ্বুদ্ধ করতে হবে যাতে তারা পাবসস এর সদস্য হয় এবং বিভিন্ন উপ-কমিটিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করে। নারীদের এবং পুরুষদের বুঝাতে হবে তাদের অংশগ্রহণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাদের মতামত সমিতির জন্য খুবই অপরিহার্য। পাবসস এর সদস্যদের সমিতি ও ঋণকার্যক্রম পরিচালনার জন্য প্রকল্প সহযোগিতা করে থাকে।

পাবসস এর নারীদের বুঝাতে হবে নারীরা যত বেশী পাবসস এর সদস্য হবেন তাদের তত বেশী সঞ্চয় ও শেয়ার বাড়বে। ফলে তাদের দিন দিন মূলধন বাড়বে এবং বড় ধরণের আয় বৃদ্ধিমূলক কাজ হাতে নিতে পারবেন এবং তাদের মুনাফাও বেশী হবে। পরবর্তীতে তারা ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবেন। অন্যান্য সংস্থা থেকে ঋণ নিলে তাদের সেবামূল্যের টাকা অন্য সংস্থাকে দিয়ে দিতে হয়। এখানে তাদের মূলধন ও সেবামূল্যের টাকা তাদের সমিতিতে ফিরে আসবে এবং তাদের মূলধন আরও বাড়বে।

তহবিল গঠন করে যদি সে টাকা পড়ে থাকে তাহলে কোন লাভ নেই। তাই হয় ঋণ কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে অথবা কোন আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে মূলধনকে কাজে লাগাতে হবে। প্রয়োজনে দক্ষতা বৃদ্ধির বিভিন্ন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে হবে, যেমন-কৃষি, হাঁস-মুরগী, মৎস্য চাষ, গবাদি পশু পালন, সমবায় ঋণ কার্যক্রম ইত্যাদি। এ সকল প্রশিক্ষণ যেন নারী-পুরুষ সবাই পায় সে দিকে খেয়াল রাখতে হবে। তাছাড়া এ সকল বিষয়ে পরামর্শ বা সুযোগ সুবিধা নেয়ার জন্য বিভিন্ন সরকারী-বেসরকারী সংস্থার সাথে যোগাযোগ রাখতে হবে। যেমন-কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায় অধিদপ্তর ইত্যাদি। এ সকল সংস্থা থেকে বিভিন্ন সময় পরামর্শ সুবিধা, প্রশিক্ষণ ও উপকরণ দিয়ে থাকে, সে সমস্ত সুযোগগুলো গ্রহণ করতে হবে। কৃষি ও মৎস্য সম্বন্ধে উন্নত প্রযুক্তি জানতে পারবেন। মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে প্রশিক্ষণ ও পারিবারিক বিষয়ে পরামর্শ পেতে পারেন। এইভাবে ধীরে ধীরে তাদের ও তাদের এলাকার দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।

এলাকার তথা দারিদ্র্যতা দূর করার জন্য নারী-পুরুষ সবাইকে সমানভাবে সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে হবে। পাবসসের সভা, বিভিন্ন ধরণের প্রশিক্ষণ, আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড ইত্যাদিতে অংশগ্রহণ করতে হবে। আমাদের দেশের প্রবনতা হচ্ছে আমরা সকল বিষয়ে পুরুষদের দক্ষ করতে চাই, নারীর কথা ভুলে যাই, তাই সার্বিক/পূর্ণাঙ্গ উন্নয়নও হচ্ছে না। কারণ দেশের অর্ধেক জনগোষ্ঠী নারীকে দক্ষতাবিহীন, প্রশিক্ষণবিহীন রেখে তাদের ছাড়া সাপ্তাহিক/মাসিক সভা করলে কখনও সার্বিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। তাই নারীরা যাতে সকল বিষয়ে অংশগ্রহণ করতে পারে বা করে সে ব্যাপারে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে তাদের জন্য সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে।

এলাকায় মানুষ যদি গরীব থেকে যায় তাহলে এলাকার দারিদ্রতা হ্রাস পাবে না। এলাকায় কিছু মানুষ আছে যাদের কোন সম্পদ নাই, তাদের কোন দক্ষতা নেই এবং আয়ের কোন ব্যবস্থা নেই। কিছু নারীরা আছেন যাদের স্বামী নেই বা পঙ্গু, স্বামী পরিত্যক্তা, তালাকপ্রাপ্তা, যাদের বিশেষ দক্ষতা নেই, লেখাপড়া নেই, কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা নেই, কয়েক পরিবারের কয়েকজন সদস্য আছেন যাদের ভরনপোষণ তাদের নির্বাহ করতে হয়, তারা গরীব পুরুষের চেয়েও গরীব। কিন্তু এই সকল মানুষের কায়িক শ্রম দেওয়ার ক্ষমতা আছে। পাবসস এর সদস্যদের দায়িত্ব হচ্ছে এই সকল দুঃস্থ মানুষকে চিহ্নিত করে জানানো যে, প্রকল্পে মাটির কাজে, গাছ লাগানোর কাজ আছে, সেখানে তারা পুরুষদের মত সমান মজুরী পাবে, কাজের সময় বাচ্চা রাখার শেড থাকবে, পানি খাওয়া ও টয়লেটের ব্যবস্থা থাকবে; এতে তাদের কর্মসংস্থান হবে এবং দারিদ্রতা হ্রাস পাবে।

এলসিএস সদস্যদেরকে উপ-প্রকল্পের পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতির (পাবসস) সদস্য করার ব্যবস্থা করতে হবে। পাবসস'র হিসাবে নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় কার্যক্রমে অন্তর্ভুক্ত করে এলসিএস সদস্যদের প্রয়োজনমত ক্ষুদ্র ঋণ কার্যক্রমের সুবিধা প্রদান করতে হবে।

পাবসস কর্তৃক গৃহীত দারিদ্র্য বিমোচন কর্মসূচীতে এলসিএস সদস্যদের অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রদেয় পেশাগত প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে (সমবায়, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন, মহিলা, যুব উন্নয়ন, সমাজসেবা, স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা, এলাকার বাণিজ্যিক ও বেসরকারী প্রতিষ্ঠান) অংশগ্রহণের জন্য উৎসাহিত করতে হবে।

ক্ষুদ্রাকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্পের বিভিন্ন উপ-প্রকল্প এলাকার জনগণের বিশেষ করে, দুঃস্থ ও গরীব মানুষদের জন্য কর্মসংস্থান কিংবা আয় বৃদ্ধিমূলক কাজের জন্য উৎসাহিত করে যেসব দুঃস্থ ও গরীব নারী অসহায় জীবনযাপণ করে তাদেরকে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কাজে নিয়োগের মাধ্যমে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারলে একজন নারী তথা একটি পরিবারের মঙ্গল সাধন হয়। তাই সব কাজে দুঃস্থ নারীদের নিয়োগ দেয়া না গেলেও তাদের জন্য মাটির কাজ গাছ লাগানো ও যত্ন নেওয়ার মতো কাজ সমূহ বরাদ্ধ দেয়া হয়ে থাকে যা করতে তাদের প্রতিবন্ধকতা কম। তাছাড়া পরিবারের জন্য আয়বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য বাস্তবভিত্তিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। তবে শুধুমাত্র দুঃস্থ নারীরাই যে অসহায় জীবন-যাপন করে তা নয়, ক্রমান্বয়ে নিম্ন ও নিম্নমধ্যবিত্ত নারীরা ও দরিদ্রতার দিকে ধাবিত হচ্ছে। তাই তাদেরকে নিয়েও চিন্তা-ভাবনা করার সময় এসেছে। সে লক্ষ্যেই জেন্ডার সংবেদনশীল দারিদ্র বিমোচন পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করার মাধ্যমে নারীর অর্থনৈতিক অবস্থান পরিবর্তন আনা জরুরী। নারীর সামাজিক অবস্থান পরিবর্তন করার লক্ষ্যে তাদেরকে কৌশলগত চাহিদা বা সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণ সুযোগ দেয়ার মাধ্যমে সামাজিক ক্ষমতা অর্জনও সম্ভব হবে।

নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধির উপায় ঃ

- গ্রামের নেতা, মাতব্বর বা প্রভাবশালী ব্যক্তিদের সহযোগীতা এবং সচেতনতা নারীর অংশগ্রহণ বৃদ্ধি করার প্রধান শর্ত।
- নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার জন্য এলাকার পুরুষ, নারীদের স্বামী ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করা বা সম্পর্ক উন্নয়ন করা অবশ্যই প্রয়োজন।
- নারীরা যাতে সভা/মিটিং এ অংশগ্রহণ করতে পারে তার জন্য তাদের বাস্তবমূখী চাহিদা পূরণের দিকে নজর দিতে হবে। বাস্তবমূখী চাহিদা পূরণ তখনই সম্ভব যখন সভার সঠিক স্থান ও সঠিক সময় বিবেচনা করা হবে।
- বাড়ীর নিকট সভার আয়োজন নারীদের অংশগ্রহণ বৃদ্ধিতে সহায়ক।
- সহজ ভাষার ব্যবহার এবং সঠিক বসার ব্যবস্থা নারীদের শোনার ও বুঝার সুবিধা হয় ।
- আঞ্চলিক ও সহজ ভাষা ব্যবহার করতে হবে।
- নারীদের সঠিক বসার ব্যবস্থা করতে হবে। যখন পুরুষ ও নারী একই সাথে সভা করেন তখন নারীদের সামনে বসার ব্যবস্থা করতে হবে যাতে তারা পরিস্কার ভাবে যে সকল বিষয় আলোচনা হবে তা শুনতে ও বুঝতে পারেন।

- যিনি আলোচনা করছেন বা সভা পরিচালনা করছেন তার দৃষ্টিভঙ্গি নারী ও পুরুষের মতামত নিতে সহায়ক হতে পারে।
- সভায় যদি কোন অংশগ্রহণমূলক পদ্ধতির ব্যবহার করা হয় নারীরা সহজে পুরুষদের সমান তালে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক হয়।
- ক্ষুদ্র আকারে মডেল, ছবি এবং আঁকা ছবি নারীদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং তাদের মতামত প্রদানে উদ্বুদ্ধ/সহায়ক।
- এলাকার শিক্ষিত নারী যেমন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, ধাত্রী, নার্স এবং টিচারদের সহায়তা নেয়।
- নারীদের সাথে তাদের কর্মস্থলে যোগাযোগ করা ।
- যে সকল নারীদের প্রতিনিধি নির্বাচন করা হয় তারা যেন সকল শ্রেণীর নারীদের সাথে মেশার যোগ্যতা থাকে। তাদের কাজের জন্য যথেষ্ট সময় ও সুযোগ থাকে। তাদেরকে, নারী ও পুরুষ উভয়েই সম্মান করে থাকেন এবং পরিবার থেকে সহযোগীতা পেয়ে থাকেন। কখনও একক নারীকে নির্বাচন করা যেতে পারে যার বিভিন্ন জায়গায় যাওয়ার সুযোগ সুবিধা আছে। যারা দৃঢ় ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন এবং যাদের চাকুরী বা প্রাতিষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা আছে। নারী প্রতিনিধিদেরকে বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে যেমন- নেতৃত্ব, আত্মবিশ্বাস উন্নয়ন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রাখতে পারে। একই প্রশিক্ষণ পুরুষদেরও দিতে হবে যাতে তারা মনে না করে তাদের বাদ দেওয়া হচ্ছে।

নারীর ভূমিকা ঃ

১. নারীদের উচিত পাবসস-এর সদস্য হওয়া।
২. নিজের আর্থিক উন্নয়নের জন্য নিয়মিত শেয়ার ও সঞ্চয় জমা দেয়া।
৩. নিজেদের ভালমন্দ, সুবিধা-অসুবিধা প্রকাশের জন্য নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করা।
৪. আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডের সাথে যুক্ত হয়ে নিজের আর্থিক উন্নয়ন করা তাতে পরিবারে তথা সমাজে তাদের মর্যদাও বৃদ্ধি পাবে এবং গোটা পরিবারেরও উন্নয়ন হবে।
৫. নারীদের উচিত পাবসস-এর সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা।
৬. নিজেদের দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করা।
৭. বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা। বিশেষ করে কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায় অধিদপ্তর ইত্যাদি।

পুরুষের ভূমিকা ঃ

১. প্রত্যেক পুরুষের উচিত তাদের মেয়ে শিশুরা পুষ্টিকর খাবার, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবা পাচ্ছে কিনা তা দেখা।
২. পারিবারিক কাজে নারীদের সহযোগিতা করা।
৩. নারীদের পাবসস-এর সদস্য হওয়ার সুযোগ করে দেয়া।
৪. নারীরা যাতে নিয়মিত সাপ্তাহিক সভায় অংশগ্রহণ করে তার ব্যবস্থা নেয়া।
৫. দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য নারীরা বিভিন্ন প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করছে কি না তা দেখা।
৬. আয় বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ডে নারীদের অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়া ও সহযোগিতা করা। এতে শুধু নারীরই উন্নয়ন হবে না, পরিবারেরও উন্নয়ন হবে।
৭. পাবসস-এর বিভিন্ন উপ-কমিটিতে নারী সদস্য আছেন কি না, উপ-কমিটির সভায় অংশগ্রহণ করছেন কিনা এবং মতামত প্রকাশের সুযোগ পাচ্ছেন কি না তা দেখা।
৮. এলসিএর নারী সদস্যরা সমান মজুরী পাচ্ছে কি না।
৯. নারী ও পুরুষ পাবসস-এর সকল সুযোগ সুবিধা সমান ভাবে পাচ্ছেন কি না।
১০. বিভিন্ন সংস্থার সাথে যোগাযোগ করা বিশেষ করে কৃষি অধিদপ্তর, মৎস্য অধিদপ্তর, প্রাণী সম্পদ অধিদপ্তর, মহিলা ও শিশু বিষয়ক অধিদপ্তর, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, সমাজসেবা, সমবায় অধিদপ্তর ইত্যাদি বা বেসরকারী সংস্থার সাথে পরিচয় করিয়ে দেয়া বা যাবার সুযোগ করে দেয়া।

অধিবেশন-৭

সমাপ্ত